সোভিয়েট-মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতি

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়



এ, মুখার্জী এণ্ড কোং লিমিটেড, কলিকাতা ১২

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর, ১৯৫১
মূল্য—দুই টাকা আট আনা মাত্র

মুদ্রাকর
শ্রীসুখলাল চট্টোপাধ্যায়
লোক-সেবক প্রেস
৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা

ভূমিকা

এই পুস্তকের প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে কিছু বলিবার আছে। বর্তমান ১৯৫১ সালের গোড়ার দিকে কোরিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে আমাকে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, কেন এই যুদ্ধের অবসান কিম্বা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না? আমেরিকা এবং সোভিয়েট রাশিয়া কি চাহে? এবং ইহাদের পরস্পরের এত বিরোধের কারণই বা কি?—এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়া দুই দেশের পররাষ্ট্রনীতির কথা অনিবার্যরূপেই আসিয়া পড়ে এবং সেই সঙ্গে সমসাময়িক পৃথিবীর ঘটনাবলী। ফলে, আমি 'যুগান্তরে' এই সম্পর্কে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিবার সংকল্প করি। উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েট দুনিয়া ও মার্কিণ দুনিয়ার মধ্যে পারস্পরিক সংঘাতের কারণগুলি এবং উভয়ের নীতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বর্ণনা করা, এবং এই দুই দেশের সরকারী মনোভাব এবং যাঁহারা মার্কিণ-নীতি কিম্বা সোভিয়েট-নীতির পক্ষপাতী, তাঁহাদের স্ব স্ব দৃষ্টিকোণ হইতে সমগ্র অবস্থার পর্যালোচনা করা। কেননা, দুই পক্ষের বক্তব্যকে যথাযথ উপস্থিত করিতে পারিলে পাঠকবর্গের পক্ষে মোটামুটি একটা ধারণা করা সম্ভব হইবে, যাহা দ্বারা তাঁহারা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে নিজেরাই একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিবেন। অর্থাৎ এই পুস্তকের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমার নিজের মতামত পাঠকবর্গের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করি নাই—যদিও আন্তর্জাতিক রাজনীতির একজন আগ্রহশীল ছাত্র হিসাবে আমার সহানুভূতি কোন্ দিকে, আশা করি প্রবন্ধগুলিতে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, কোন লেখকের পক্ষেই তাঁহার নিজস্ব মতামত ও চিন্তাধারা গোপন করা সম্ভব নহে। বোধ হয় তার প্রয়োজনও নাই; কারণ, স্বকীয় চিন্তাধারার চিহ্ন না থাকিলে অধিকাংশ লেখাই ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

প্রবন্ধগুলি দৈনিক পত্রিকার জন্য রচিত হইয়াছিল। ফলে, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অতীত ইতিহাসের আলোকে মার্কিণ পররাষ্ট্র-নীতিকে বিচার করিতে পারি নাই। ইহা নিতান্তই সমসাময়িক কালের ঘটনাবলী এবং সোভিয়েট-বিরোধিতাকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। ফলে, অতীত ইতিহাসে অভিজ্ঞ পাঠকের নিকট মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতি 'সম্পূর্ণ' বলিয়া বিবেচিত না হইবারই সম্ভাবনা। এই ত্রুটি আমি নিজেই স্বীকার করিতেছি। তবে, আমার স্বপক্ষে এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে, মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতি নিতান্তই আধুনিক কালের। ইহার স্বকীয় চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য, যাহা বর্তমান আন্তর্জাতিক জগতে প্রকাশমান, তাহার সূত্র প্রথম মহাযুদ্ধের আমল হইতে এবং ইহার নাটকীয় রূপ প্রকাশ পাইতেছে মাত্র ১৯৪০ সালের পর হইতে, অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে

আমেরিকার যোগদানের পর। বৃহৎ রাষ্ট্রজাতিগুলির মধ্যে আমেরিকা সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ১৮৬১ খৃঃ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধের পর মাত্র ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি, সমৃদ্ধি এবং অভাবনীয় উন্নতির সুরু। সুতরাং উহার পররাষ্ট্রীয় নীতিও বর্তমান কালের, যদিও পুঁথিগত তথ্যের আলোচনার দিক হইতে আমরা প্রথম যুগের ওয়াশিংটন, জেফারসন, ম্যাডিসন ও মনরো—এই খ্যাতনামা প্রেসিডেণ্টগণের ইতিহাসের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারি।

সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতির আলোচনায় আমি যথাসম্ভব ইতিহাসের উদ্ঘাটন করিয়াছি। কারণ, রাশিয়ার বিরুদ্ধেই অভিযোগ ও প্রচারকার্যের মাত্রা বেশী চলিয়াছে। সুতরাং ঐগুলি খণ্ডনের জন্য ইতিহাসের গভীর আবর্তের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে এবং সেজন্য সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতির আলোচনা অধিকতর ব্যাপক ও বিশ্লেষণমূলক হইয়াছে, যদিও অনেক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সার-বস্তু লইয়া আলোচনা করিয়াছি। তবে, আমার সাধ্যানুসারে প্রয়োজনীয় কোন প্রশ্ন এবং বিষয়ের আলোচনাই বাদ দেই নাই। রাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়া যেমন অন্য সকলের চেয়ে পৃথক, উহার পররাষ্ট্রীয় নীতিও তাহাই। সময় ও সুযোগ থাকিলে এই পররাষ্ট্রনীতিকে অবলম্বন করিয়াই একটি বৃহৎ পুস্তক লেখা যাইত।

বর্তমানে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলি গত ফেব্রুয়ারী মাসে "মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতির ভূমিকা" এবং মার্চ-এপ্রিল মাসে "সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতির ভূমিকা" নামে দৈনিক 'যুগান্তরে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সেই সময় শিক্ষিত পাঠক-সমাজে এগুলি বিপুল সাড়া জাগাইয়াছিল। এজন্য বহু দিক হইতে আমার অভিনন্দন লাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল, যাহার জন্য আমি পাঠক-সাধারণের নিকট কৃতজ্ঞ।

সুপরিচিত সাহিত্যিক শ্রীবিনয় ঘোষ এবং শ্রীসরোজ আচার্য বইপত্র দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ।

নানা অনিবার্য কারণে এই পুস্তক প্রকাশে অত্যন্ত বিলম্ব হইল এবং বহুল পরিমাণে যে ইংরাজী উদ্ধৃতিগুলি এই পুস্তকে রহিয়াছে (প্রামাণিক মতামত উল্লেখ করার প্রয়োজনে), সময়াভাবে সেগুলিরও বাঙলা অনুবাদ দেওয়া সম্ভব হইল না। এই ত্রুটির জন্য পাঠকদের কাছে মার্জনা চাহিতেছি।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

৫ই নভেম্বর, ১৯৫১।

শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ

করকমলেষু—

—'যুগান্তরের' পরিচালনায়
ও মানসিক রূপসজ্জায়
যাঁর দান স্মরণীয়।—

সূচীপত্র

পৃষ্ঠাঙ্ক

মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতি

সোভিয়েট মতবাদের ভীতি

প্রতিদিনের সংবাদপত্রে দেখা যায় আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া যেন বর্তমান দুনিয়ার ভাগ্যনিয়ন্তার আসন গ্রহণ করিয়াছে এবং এই দুইয়ের মধ্যে প্রতিদিন বিরোধ ও সংঘর্ষ চলিতেছে। কিন্তু কেন এই বিরোধ এবং আমেরিকার বক্তব্য কি, তাহা জানা ও বুঝা দরকার। কেননা, পৃথিবীর ভাগ্য যাঁহাদের চিন্তা ও কার্যাবলীর সঙ্গে জড়িত, তাঁহাদের সম্পর্কে উপযুক্ত ধারণা ও চৈতন্য না থাকিলে আমাদের জাতীয় স্বার্থ ও পররাষ্ট্রীয় নীতির দিক দিয়া আমরা গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হইতে পারি। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট কিম্বা গভর্ণমেণ্টের উপর প্রভাবশীল ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের মতামত হইতেই এ বিষয়ের আলোচনা করিতেছি। এই মতামত প্রতিফলিত হইতেছে মার্কিণ সরকারের দৃষ্টিকোণ হইতে, আমাদের দিক হইতে নহে—এ কথাটি পাঠকবর্গের স্মরণ রাখা দরকার এবং আশা করা যায়, পাঠকেরা নিজেরাই এ বিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধান্তে পেঁছিতে পারিবেন।......

১৯১৭ সালের সোভিয়েট বিপ্লবের পর হইতেই ধনতান্ত্রিক জগৎ রাশিয়াকে এক প্রকাণ্ড বিপদ বলিয়া মনে করিতেছে। মাঝখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফ্যাসিজমের ক্রুর মতবাদ এবং হিটলারী সাম্রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধে আমেরিকা, বৃটেন ও রাশিয়া মিত্ররূপে সংগ্রাম করিলেও সোভিয়েট কমিউনিজমকে চার্চিল, রুজভেল্ট কিম্বা ট্রুম্যান, এটলি কেহই পৃথিবীর শান্তির পক্ষে অনুকূল মনে করেন নাই। সুতরাং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবসানের পর প্রায় প্রতিপদক্ষেপে রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে মতভেদ দেখা দিতেছে। বর্তমান মার্কিণ সরকারের যাঁহারা নীতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন কিম্বা করিতেছেন, তাঁহারা ডেমোক্রাট বা রিপাব্লিকান যে দলভুক্তই হউন না কেন সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে তাঁহারা প্রায় সকলেই একমত। তাঁহাদের নালিশ রাশিয়ার জনসাধারণ কিম্বা রুশ জাতির বিরুদ্ধে নহে, তাঁহারা অভিযুক্ত করিতেছেন সোভিয়েট শাসকবর্গ এবং শাসকস্থানীয় কমিউনিষ্ট পার্টিকে, যে পার্টির পোলিট ব্যুরোর নির্দেশেই সমস্ত নীতি ও কর্মপদ্ধতি পরিচালিত হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন যে, হিটলারের আত্ম-জীবনী ('Mein Kampf') যেমন বিগত ত্রিংশ দশকের ফ্যাসিষ্ট জার্মাণীর নিকট বাইবেল স্বরূপ ছিল, তেমনই লেনিনের ও বিশেষভাবে ষ্ট্যালিনের মতবাদ, উপদেশ ও নির্দেশই কমিউনিষ্টদের নিকট বেদের মত অভ্রান্ত বলিয়া

বিবেচিত হইতেছে। ষ্ট্যালিনের পুস্তক ('Problems of Leninism') ৩৫টি ভাষায় অনুদিত হইয়া একমাত্র ১৯৪৭ সাল পর্যন্তই ১ কোটি ৮০ লক্ষ কপি বিক্রি হইয়াছে এবং বর্তমানে সম্ভবতঃ উহার সংখ্যা প্রায় দুই কোটিতে দাঁড়াইয়াছে! সুতরাং এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহে কমিউনিষ্ট পার্টি ও সোভিয়েট রাশিয়ার গতি-নির্দেশকের মত। এই পুস্তকের মতামত উদ্ধৃত করিয়া মার্কিণ রাষ্ট্র-নেতারা বলিতেছেন যে সোভিয়েট কমিউনিজমের আরম্ভ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস-হীনতা কিম্বা নাস্তিকতা হইতে। সুতরাং ঈশ্বর যখন নাই, তখন নৈতিক বিধি-বিধানও নাই এবং জড় জগৎ বা মানুষের বৈষয়িক জীবনই একমাত্র বড় কথা। 'আইডিয়া' ও চিন্তার জগৎ স্বীকার্য বটে, কিন্তু তাহাও বস্তু-জগতেরই প্রতিবিম্ব মাত্র। সমাজের এই বৈষয়িক জীবনের উন্নতি নির্ভর করে জনগণের বা শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের হাতে ক্ষমতা লাভের দ্বারা। কারণ, কলকারখানা ও ক্ষেত-খামার ইত্যাদির উৎপাদন নির্ভর করে এই জনসাধারণের উপর এবং তাহারা ধনিক শ্রেণী (বর্তমান দুনিয়ার রাষ্ট্র-যন্ত্র যাহাদের করায়ত্ত) কর্তৃক ক্রমাগত শোষিত হইতেছে। এই শোষিত জনগণের নিজস্ব কোন অধিকার নাই, অতএব ধনতান্ত্রিক সমাজে গণতন্ত্র বলিয়া কোন বস্তু নাই। সুতরাং ধনতন্ত্র-শাসিত এই সমস্ত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিয়া একমাত্র 'মজদুর-রাজ' বা 'Dictatorship of the Proletariat' প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। শান্তি-পূর্ণভাবে কিম্বা অহিংস উপায়ে ইহা সম্ভব নহে। কারণ, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলপ্রয়োগ ও সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল এবং এই ক্ষমতা ক্যাপিটালিষ্ট ও বুর্জোয়াদের হস্তগত। সশস্ত্র বলপ্রয়োগ, অর্থাৎ গণ-বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ, গেরিলাযুদ্ধ এবং সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি ছাড়া এই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা সম্ভব নহে, যাহার প্রস্তুতি স্বরূপ সুযোগ ও সুবিধামত সমস্ত কলকারখানায় রাজ-নৈতিক ধর্মঘট, নাশকতামূলক কার্য অনুষ্ঠান, কৃষকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া বিদ্রোহে উস্কানি দান, বিভিন্ন উচ্চপদে ও চাকুরিতে ঢুকিয়া গোয়েন্দাগিরি ও পঞ্চম-বাহিনীর কার্য, এক কথায় সরকারী সংগঠনগুলিতে ও সমাজ-জীবনে ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্বলতার সৃষ্টি করিতে হইবে। যতদূর সম্ভব গভর্ণ-মেণ্টগুলিকে ত্রাসের মধ্যে ফেলিতে হইবে। তারপর সুযোগমত এবং উপযুক্ত মুহূর্তে গণ-অভ্যুত্থানের প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল এবং প্রতিক্রিয়াশীল বিত্তশালী শ্রেণীকে ধ্বংস করিতে হইবে। ঈশ্বর যখন নাই, তখন নীতিরও ঝলাই নাই। সুতরাং যে-কোন পন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। কারণ, উদ্দেশ্য মহৎ—শোষণ ও দাসত্ব হইতে মুক্তি বিধানপূর্বক সমগ্র

মানুষকে উন্নততর জীবনের প্রতিষ্ঠা দান। কিন্তু ধনিক রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য-বাদীরা ইহাতে বাধা দিবে এবং সোভিয়েট রাশিয়াকে ধ্বংসের জন্য সর্বপ্রকার হীনতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও গোয়েন্দাগিরি অবলম্বন করিবে এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বাধাইবে। "The bourgeois states and their organs ......are waiting for a favourable opportunity to attack it (Russia) by armed force"—"বুর্জোয়া রাষ্ট্রসমূহ এবং তাহাদের মুখ-পাত্রেরা সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা রাশিয়াকে আক্রমণের জন্য অনুকূল মুহূর্তের অপেক্ষা করিতেছে।" (ষ্ট্যালিনের মন্তব্য)।

১৯১৭ সাল হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে এরূপ একটি যুদ্ধবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বলিয়া সোভিয়েট রাশিয়া মনে করিতেছে। সমগ্র পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের এরূপ একটি চক্রবেষ্টনী রহিয়াছে এবং ইহার বিরুদ্ধে পাল্টা একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রবেষ্টনী গড়িয়া তুলিতে হইবে। অন্যথা রাশিয়ার আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করা কঠিন। ইহার জন্য দেশে দেশে যে বিপ্লবের প্রয়োজন, তাহা কিছুতেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। ষ্ট্যালিনের মতে তেমন সম্ভাবনা আপাততঃ উন্মাদের কল্পনা মাত্র, যদিও দূর ভবিষ্যতে সম্ভব হইতে পারে, যখন পৃথিবীর বড় বড় পুঁজিবাদী দেশের অনেকগুলিতে সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হইবে। কিন্তু তাহা আজ নয় এবং উহার আগে সংঘর্ষ অনিবার্য। লেনিন বলিয়াছিলেনঃ—

"We are living not merely in a state, but in a system of states, and the existence of the Soviet Republic side by side with Imperialist states for a long time is unthinkable. One or the other must triumph in the end. And before that end supervenes, a series of frightful collisions between the Soviet Republic and the bourgeois states will be inevitable."......—"আমরা কেবল একটি রাষ্ট্রের মধ্যে বাস করিতেছি না, বরং একটি রাষ্ট্রশৃঙ্খলার মধ্যে বাস করিতেছি। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়া যে পাশাপাশি দীর্ঘকাল বাস করিতে পারিবে, ইহাও অকল্পনীয়। শেষ পর্যন্ত এক পক্ষ না এক পক্ষ জয়লাভ করিবেই। এবং সেই পরিণাম আসিবার পূর্বে সোভিয়েট রিপাব্লিক ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পর পর কতকগুলি ভয়াবহ সংঘর্ষ অনিবার্যরূপেই ঘটিবে।" সুতরাং এই অনিবার্য সংঘর্ষ হইতে আত্মরক্ষা ও জয়লাভের জন্য, লেনিনের মতে, সামরিক

সংগঠনেরও দরকার। সোভিয়েট ইউনিয়নের গঠনের মধ্যেই এই সামরিক চরিত্র রহিয়া গিয়াছে এবং কমিউনিষ্ট পার্টি ও উহার নেতৃবৃন্দকে 'জেনারেল ষ্টাফ' বা সেনানীমণ্ডলী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, যাহাদের লক্ষ্য হইবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল। আর গোটা দুনিয়ার মজদুর শ্রেণীর পক্ষে সোভিয়েট শ্রমজীবীকে রণদুর্মদ বাহিনীরূপে বিবেচনা করা হইয়াছে। ইহার জন্য আবার কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে বজ্রকঠোর নিয়মশৃঙ্খলা চাই এবং কোন প্রকার মতভেদ ও উপদল গঠন বরদাস্ত করা হইবে না—বিরোধীদিগকে 'সরাইয়া ফেলিতে' হইবে। মজদুর-শাসিত রাষ্ট্র শ্রেণীহীন, সুতরাং অন্য কোন রাজনৈতিক দলেরও সেখানে প্রয়োজন নাই—একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়া, যাঁহারা সমগ্র জনসাধারণের একমাত্র স্বার্থরক্ষক। এই প্রকার রাষ্ট্রশাসনে তথাকথিত ব্যক্তিস্বাধীনতাও অনাবশ্যক এবং সমস্ত সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানকে কমিউনিষ্ট মতবাদ, আদর্শ ও লক্ষ্য অনুযায়ী চলিতে হইবে।

মার্কিণ রাষ্ট্রনেতাদের মতে, সোভিয়েট ইউনিয়ন পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তেমন লক্ষ্যই অনুসরণ করিতেছে, যাহার ফলে দেশ দেশান্তরে সশস্ত্র বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইতে পারে। তাহারা গোড়া হইতেই আমেরিকা ও বৃটেনকে ধনতান্ত্রিক জগতের অগ্রগামী এবং নেতৃস্থানীয় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। এজন্য সোভিয়েট ইউনিয়নকে সর্বদাই শত্রুবেষ্টিত এবং আক্রমণের মুখে বলিয়া চিত্রিত করা হইতেছে। বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদী বলিয়া অভিহিত ইংগ-মার্কিণ রাষ্ট্রগুলিকে সর্বদা ঘৃণা করিতে এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করিতে বলা হইতেছে। ইংগ-মার্কিণ নেতারা ফ্যাসিষ্ট, সাম্রাজ্যবাদী, যুদ্ধবিলাসী ইত্যাদি—এই সমস্ত কথা অনবরত চারিদিকে প্রচার করা হইতেছে এবং সম-সাময়িক ইতিহাসকে বিকৃত ও মিথ্যা রঙ দেওয়া হইতেছে। কমিউনিষ্ট এবং অ-কমিউনিষ্ট দেশগুলির মধ্যে কোন প্রকার সামাজিক মেলামেশা, এমন কি পারস্পরিক বিবাহ পর্যন্ত নিষিদ্ধ। সোভিয়েট রাশিয়ার বিরাট সামরিক শক্তি ও সংগঠন রহিয়াছে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, তাহারা যে-কোন মুহূর্তে অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। বরং তাহারা মুখে শান্তির বাণীই প্রচার করে। কারণ, ধনিক রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে সোভিয়েট কমিউনিজমের বেষ্টনী গড়িয়া তুলিতে হইলে 'national war' বা জাতিগত যুদ্ধের বদলে শ্রেণীগত যুদ্ধ বা 'class war' -এর পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এই জন্যই ষ্ট্যালিন কোন কোন সময় বলেন যে, আমেরিকা ও রাশিয়া পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে বাস করিতে পারে। অর্থাৎ এই দুইয়ের মধ্যে জাতিগত যুদ্ধের দরকার নাই। কিন্তু

শ্রেণী-সংগ্রামের দ্বারা বিরোধী রাষ্ট্রগুলিকে কাবু করা যাইতে পারে এবং এই সংগ্রামের হাতিয়ার হইতেছে কমিউনিষ্ট পার্টিসমূহ। ইহাদের আক্রমণাত্মক রণ-নীতির কৌশল হইতেছে শ্রেণী-সংগ্রাম, গৃহযুদ্ধ, গেরিলা যুদ্ধ, বিভিন্ন সংগঠনে অনুপ্রবেশ এবং সন্ত্রাসবাদ ও প্রচারকার্য। চীন, ইন্দোচীন, গ্রীস, ফিলিপাইন, ব্রহ্মদেশ, মালয় ইত্যাদিতে এই সমস্ত পন্থার একাধিক কৌশল অনুসৃত হইয়াছে কিম্বা হইতেছে। রাজনৈতিক ধর্মঘট, নাশকতামূলক কার্যকলাপ এবং পার্লামেণ্টারি শাসনের অচল অবস্থা সৃষ্টি—এই কৌশলগুলি পশ্চিম ইউরোপে, বিশেষভাবে সাম্প্রতিক ফ্রান্সে ও ইতালীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু আমেরিকানদের দৃষ্টিতে সোভিয়েট কমিউনিষ্টদের কৌশল হিটলারী ফ্যাসিষ্ট-দের চেয়েও মারাত্মক। কারণ, কমিউনিষ্টরা প্রয়োজনমত 'পশ্চাদপসরণের রণ-কৌশল' (tactics of retreat) অনুসরণ করিতে জানে—তাহারা হিটলারের মত গোঁয়ার ও আত্মসর্বস্ব নহে। সুতরাং কমিউনিষ্টরা এবং সর্বত্র আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করে না—দরকার মত আত্মগোপন করে, পিছাইয়া যায়, এমন কি নিয়মতান্ত্রিক পার্লামেণ্টারি পন্থানুসরণ এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংঘগুলিতে যোগ দিয়া আইনসম্মত আন্দোলন করিয়া থাকে। কিন্তু সর্বদাই তাহাদের লক্ষ্য থাকে চরম আঘাত হানিবার উপযুক্ত মুহূর্ত এবং উহার জন্য ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা। সোভিয়েট কমিউনিজম কেবল কোনও ব্যক্তির আয়ুর মাপকাঠিতে বিপ্লব অনুষ্ঠানের কথা চিন্তা করে না—দীর্ঘতর সময়ের জন্য প্রয়োজন অনুসারে তাহারা অপেক্ষা করিতে জানে। তাহারা সংস্কারেও (বা reform-এ) বিশ্বাস করে না, কেবলমাত্র সাময়িক সুবিধা বা অসুবিধা দিয়া উহার বিচার করে এবং সংস্কার যদি বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইবার একটা ধাপ বলিয়া বিবেচিত হয়, কেবল মাত্র তখনিই উহার সমর্থন করে। ঠিক অনুরূপ কারণেই দম লইবার জন্য কিম্বা সময় পাওয়ার উদ্দেশ্যে কোনও কোনও সময় তাহারা কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গে বাহ্যিক আপোষও করিতে পারে। কিন্তু উহা নিতান্তই বিরুদ্ধ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ ছাড়া আর কিছু নয়।

বর্তমান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতর শাসক ও রাজনীতিক মহলে সোভিয়েট রাশিয়া ও কমিউনিষ্ট মতবাদ সম্পর্কে এই সমস্ত ধারণা বহুদূর গভীরে প্রবেশ করিয়াছে। এজন্যই তাঁহারা সোভিয়েট সাম্যবাদকে মার্কিণ গণতন্ত্র, খৃষ্টানী সভ্যতা ও সমাজের পক্ষে নিদারুণ বিপদ-স্বরূপ বলিয়া মনে করেন। ধনপতিগণের এবং শ্রমশিল্পের যে ঐশ্বর্যে আমেরিকা ভাগ্যবান তাহা সোভিয়েট কমিউনিজমের অগ্রগতিতে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং সোভিয়েট সাম্যবাদ যদি ক্ষমাহীন

হইয়া থাকে, তবে মার্কিণ গণতন্ত্রবাদও দয়াহীন হইবে। যাহারা "ঈশ্বরদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী" তাহাদিগকে শক্তিশালী আমেরিকা খাতির করিবে কেন এবং কেনই বা তোষণ-নীতির দ্বারা তুষ্ট করিতে যাইবে? বর্তমান মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতির পিছনে এই রাজনৈতিক তত্ত্ব, মতবাদ ও মনোভাব রহিয়াছে—যাহা তাহাদের কার্যেও প্রতিফলিত হইতেছে।

যুদ্ধকালীন মৈত্রী ও সহযোগিতা

সোভিয়েট রাশিয়া ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যখন মূলগত দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদের এতই বৈষম্য, তখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় উভয়ে কিভাবে একত্র হইলেন এবং কেনই বা পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা হিটলারকে বধ করিলেন? যুদ্ধজনিত এই সহযোগিতার বামপন্থী ব্যাখ্যা যাহাই হউক না কেন, মার্কিণ পক্ষের সহজ বক্তব্য এই যে, নিছক আত্মরক্ষার খাতিরেই তখন রাশিয়ার সহিত সহযোগিতা করিতে হইয়াছিল এবং সোভিয়েটের পক্ষেও আত্মরক্ষার জন্য ইঙ্গ-মার্কিণের সঙ্গে বন্ধুতা ছাড়া উপায় ছিল না। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর যখন হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং ১৯৪০ সালে যখন পশ্চিম ইউরোপ দখল হইয়া গেল, তখনও আমেরিকা যুদ্ধে নামিবে এমন কোন লক্ষণ স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু ক্রমে ঘটনার গতি দ্রুত দিক পরিবর্তন করিতে লাগিল এবং ১৯৪১ সালের শেষের দিকে মহাযুদ্ধ প্রায় সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। জার্মাণী কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণ ও জাপান কর্তৃক পার্ল হারবার আক্রমণ ইতিহাসের নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল। জাপানের সঙ্গে জার্মাণী ও ইতালী আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। প্রশান্ত মহাসমুদ্র ও পূর্ব-এশিয়ায় জাপানের এই রণতাণ্ডব আমেরিকাকে বিপন্ন করিয়া তুলিল। সেই সময় একমাত্র জার্মাণীরই আমেরিকার তুলনায় দ্বিগুণ সামরিক শক্তির সুবিধা ছিল—সৈন্য ও বিমানবলের বিবেচনায়। ইহার সঙ্গে জাপানের কথা মনে রাখিবার মত। কারণ, জাপানই আমেরিকাকে প্রত্যক্ষ আক্রমণের দ্বারা সংকটে ফেলিয়াছিল এবং এই জাপানের হাতে তখন ৫০ লক্ষ সৈন্য প্রস্তুত ছিল! এই অবস্থায় আমেরিকার মূল নীতি দাঁড়াইল—যাহারা ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লড়িবে তাহারাই আমেরিকার বন্ধু এবং সেই সামরিক মিত্রতা প্রসারিত হইল যুধ্যমান রাশিয়ার প্রতি। আমেরিকা স্বীকার করে যে, এই মিত্রতার পর

সাড়ে তিন বৎসর ধরিয়া যে যুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহাতে সোভিয়েট বাহিনী জার্মাণীর ২০০ ডিভিসনের অধিক সৈন্যকে রণাঙ্গনে আটকাইয়া রাখিতে ও পরাজিত করিতে পারিয়াছিল—অন্যথা এই সৈন্যদল আমেরিকার বিরুদ্ধে যুঝিতে পারিত। জার্মাণীর প্রথম আক্রমণের ধাক্কা সামলাইয়া উঠিবার পর যখন বুঝা গেল যে, সাহায্য ও সহযোগিতা পাইলে রাশিয়া জার্মাণীকে সাফল্যের সহিত প্রতিরোধ করিতে পারিবে, তখন সোভিয়েট সামরিক শক্তিকে জীয়াইয়া রাখাই প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও সমরবিশারদগণের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছিল। ইহার মধ্যে রাজনীতির কোন প্রশ্ন ছিল না। মার্কিণ সিনেটের পররাষ্ট্র কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ টম কোন্যালি গত ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০, যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন,—'In the interest of their own survival the democracies, however, much though they detested the internal dictatorship of the Soviets, could adopt no other policy than to welcome the support of the Russian armies......The men in charge of our war effort were thinking of the quickest way to win the war and the best way to save American lives. They were not thinking of politics.' —"সোভিয়েট রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ডিক্টেটরির প্রতি গণতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহের যত বিতৃষ্ণাই থাকুক না কেন, আসলে তাহাদের নিজেদের টিকিয়া থাকার গরজেই সোভিয়েট বাহিনীর সাহায্য গ্রহণের নীতি অনুসরণ না করিয়া উপায় ছিল না। আমাদের যুদ্ধোদ্যমের ভার যে সমস্ত ব্যক্তির উপর ছিল, তাঁহারা চিন্তা করিতেছিলেন সর্বাপেক্ষা কোন্ দ্রুততর উপায়ে যুদ্ধ জয় এবং সর্বোত্তম কোন্ উপায়ে মার্কিণ সৈন্যদের জীবন রক্ষা করা যায়। তাঁহারা রাজনীতির কথা চিন্তাই করিতেছিলেন না।"

এমন কি যুদ্ধকালীন খ্যাতনামা মার্কিণ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ কর্ডেল হাল পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন যে, রাশিয়ার সহযোগিতা ছাড়া জার্মাণীকে পরাজিত করা বোধহয় সম্ভব হইত না—বরং উহার সহিত আপোষে সন্ধি করিতে হইত, যাহার ফলে পৃথিবীতে আরও বহু বৎসর ধরিয়া যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকিত। মহাযুদ্ধের সেই মহা বিপদের দিনে রুজভেল্ট, কর্ডেল হাল, ওয়েণ্ডেল উইলকি, হেনরি ওয়ালেস, সামনার ওয়েলস প্রভৃতি মার্কিণ নেতাদের চিত্ত আজিকার মত তিক্ত ছিল না, বরং ষ্ট্যালিনের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব এবং রাশিয়ার প্রতি সপ্রশংস দৃষ্টি ছিল। (কর্ডেল হাল তাঁহার যুদ্ধকালীন স্মৃতি-পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, তেহরাণে ষ্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে রুজভেল্ট যেন শিশুর মত কৌতূহল

দেখাইতেছিলেন মার্শাল ষ্ট্যালিন সম্পর্কে!) কিন্তু মূল প্রশ্ন ছিল সামরিক জয়লাভ ও আত্মরক্ষা এবং এই সামরিক প্রশ্নের বিবেচনাতেই জার্মাণী ও জাপান সম্পর্কে রুশ-সহযোগিতার নীতি অনুসৃত হইয়াছিল। সেই সময় যত কিছু চুক্তি ও সর্ত ইত্যাদি স্থির হইয়াছে, সেগুলির মূল ছিল সামরিক সমস্যার মধ্যে। ঠিক সেই কারণেই জার্মাণী ও বার্লিন সম্পর্কে এলাকা ভাগ করিবার নীতিও গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। পূর্ব-ইউরোপে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রাধান্যও অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। কারণ, লালফৌজ এই সমস্ত দেশে প্রবেশ করিয়া জার্মাণ বাহিনীকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়াছিল। কিন্তু ইয়াল্টা চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েট-অধিকৃত পূর্ব-ইউরোপে 'স্বাধীনভাবে' নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে কথা ছিল, তাহা পালিত হয় নাই। আমেরিকা ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছে। দূরপ্রাচ্যে ও জাপান সম্পর্কে ইয়াল্টায় যে চুক্তি হইয়াছিল, তাহাও নিতান্ত সামরিক প্রয়োজনে। কারণ, উহা দ্বারা মাঞ্চুরিয়ায় ও কোরিয়ায় রণ-দুর্মদ জাপানী বাহিনীকে রাশিয়ার সঙ্গে রণ-লিপ্ত রাখার সুযোগ ঘটিয়াছিল, যাহার ফলে মহাযুদ্ধ প্রত্যাশিত সময় অপেক্ষা বহু পূর্বেই শেষ হইয়া গিয়াছিল এবং বহু লক্ষ মার্কিণ সৈন্যের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হইয়াছিল। মিঃ টম কোন্যালি বলিতেছেন,—"At Yalta the Soviet Union promised to enter the war against Japan within 3 months after the end of the war in Europe. Our military leaders were jubilant. They were convinced that the Soviet promise meant the difference between death and life for scores of thousands of American troops." —"ইয়াল্টাতে সোভিয়েট ইউনিয়ন এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে, ইউরোপীয় যুদ্ধ শেষ হইবার পর তিন মাসের মধ্যেই তাহারা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে। আমাদের সামরিক নেতারা ইহাতে উল্লসিত হইয়াছিলেন। কারণ, তাঁহারা নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, এই সোভিয়েট প্রতিশ্রুতি দ্বারা হাজার হাজার বা অজস্র মার্কিণ সৈন্যের জীবন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবে।" ইয়াল্টা চুক্তির দ্বারা জাপানী যুদ্ধের দ্রুত অবসান ও মার্কিণ সৈন্যের অধিকতর ক্ষয় ও ক্ষতি নিবারণ ছাড়াও আর একটি উল্লেখযোগ্য লাভ হইয়াছিল। মাঞ্চুরিয়ার উপর রাশিয়া জাতীয়তাবাদী চীনের সার্বভৌম অধিকার মানিয়া লইয়াছিল এবং চিয়াং কাইসেক গভর্ণমেন্টের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদনে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছিল। অর্থাৎ ইউরোপ এবং রাশিয়া, এই দুই মহাদেশ সম্পর্কেই রুশ-মার্কিণ সহযোগিতার নীতি ফলপ্রসূ হইয়াছিল। 'ইহা দ্বারা জার্মাণী ও জাপানের সম্পূর্ণ পরাজয় তো

ঘটিয়াছে বটেই, অধিকন্তু ফ্যাসিজমের উৎপাত হইতে মানুষের সভ্যতা ও স্বাধীনতা রক্ষা পাইয়াছে। আমেরিকার দাবী এই যে, মার্কিণ সহযোগিতার দ্বারা সোভিয়েট রাশিয়াও কম লাভবান হয় নাই। সেদিন নাৎসী আক্রমণে বিপন্ন রাশিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছ হইতে অভূতপূর্ব সাহায্য পাইয়াছিল। ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাস হইতে ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত রাশিয়া আমেরিকার কাছ হইতে ৭,৮০০ বিমান, ৪,৭০০ ট্যাঙ্ক ও ট্যাঙ্ক-ডেস্ট্রয়ার, ১,৭০,০০০ মোটর ট্যাঙ্ক, ৬০ লক্ষ জোড়া মিলিটারি বুট, ২ লক্ষ ফিল্ড টেলিফোন, ৭ লক্ষ মাইল দীর্ঘ টেলিফোন-তার, ১ লক্ষ ৭৭ হাজার টন বিস্ফোরক, ৭ লক্ষ ৪০ হাজার টন গ্যাসোলিন, ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন ইস্পাত এবং ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টন খাদ্যদ্রব্য পাইয়াছিল। এগুলি ছাড়া রাশিয়া কয়েকটি কল-কারখানার সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতিও পাইয়াছিল এবং টাকার হিসাবে এই মোট মার্কিণ সাহায্যের পরিমাণ কয়েক সহস্র কোটি, যাহা 'ঋণ ও ইজারা' সর্তানুযায়ী দেওয়া হইয়াছিল। (এই সংখ্যাগুলি মার্কিণ সমর-দপ্তরের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সংক্রান্ত একখানি ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত।) ইহা দ্বারা রাশিয়ার সামরিক শক্তির প্রভূত সহায়তা হইয়াছিল।

যুদ্ধজনিত এই সহযোগিতা হইতে আমেরিকা ও রাশিয়ার শাসনকর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার জন্য এই সহযোগিতা বজায় রাখা দরকার। কেবল সোভিয়েট-মার্কিণ সহযোগিতাই নহে, পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গেও সৌভ্রাত্রের প্রয়োজন। চার্চিল এবং রুজভেল্ট এ বিষয়ে বহু পূর্বেই একমত হইয়াছিলেন এবং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট মানুষের 'চতুর্বিধ স্বাধীনতা' (Four Freedoms) রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়া এক ঐতিহাসিক ঘোষণা জারী করিয়াছিলেন। মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে নূতন করিয়া বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘের কিম্বা ইউ-এন-ও'র পত্তন সুরু হইয়াছিল। মানুষের শান্তি ও কল্যাণের জন্য এই সমস্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আমেরিকা কেবল অগ্রণীই ছিল না, প্রভূত অর্থব্যয়ের দায়িত্ব যেমন তাহারা গ্রহণ করিয়াছে, তেমনই নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া এগুলিকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। দুনিয়ার শান্তিরক্ষার জন্য বিশেষভাবে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখা যে একান্ত প্রয়োজন, ইহা মার্কিণ কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁহাদের অভিযোগ এই যে, মহাযুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনে যে ইয়াল্টা ও পটসডাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, উহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট, চীন,

পূর্ব-এশিয়া, পূর্ব-ইউরোপ ও মধ্য-ইউরোপে তাঁহাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছেন, যাহা চুক্তির অন্তরালবর্তী সহযোগিতা ও মৈত্রীর বিরোধী। পৃথিবীর শান্তিরক্ষার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত সদ্ভাব রক্ষার প্রয়োজন বটে, কিন্তু যে কোন সর্তেই কি এই সদ্ভাব রাখিতে হইবে? এবং যদি আমেরিকার পক্ষে তাহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলেই কি তাহাকে 'যুদ্ধবিলাসী' বলিয়া অপবাদ দিতে হইবে? আমেরিকার অন্যতম পাণ্ডা এবং রিপাব্লিকান দলের স্বনামধন্য নেতা জন ফষ্টার ডুলেস বলিতেছেন যে, যুদ্ধজনিত মার্কিণ মৈত্রী ও সহযোগিতাকে সোভিয়েট রাশিয়া 'তোষণনীতির' মনোভাব বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে—১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইয়াল্টা বৈঠক হইতে এই ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। ফলে, "যে কোন মূল্যে সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত সহযোগিতা"—ইহাই হইতেছে ওয়াশিংটনের প্রতি মস্কোর দাবী— "The United States in the interest of peace must do whatever the Soviet Union demanded as the price of agreement. If the United States did not, those who represented it would be 'war-mongers'."

রিপাব্লিকান, ডেমোক্রাট এবং মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট—প্রায় সমস্তেরই রাশিয়া সম্পর্কে বক্তব্য এই ধরণের। অর্থাৎ যাঁহারা বিপদের বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা সম্পদের বন্ধু হইতে পারিতেছেন না। ইহার জন্য আমেরিকা দায়ী করিতেছেন সোভিয়েট রাশিয়াকে, আর রাশিয়া আমেরিকাকে। কারণ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মতে রাশিয়া লাল সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারে উৎসুক এবং আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ দেশে দেশে যুদ্ধজনিত দুর্গতির সুযোগ লইয়া এই সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর। আর রাশিয়ার মতে ধনিক চক্রান্তের দেশ আমেরিকা, যাহাদের পুঁজিপতি ও কোটিপতিরা বিভিন্ন দেশের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে চক্রান্ত করিয়া জনসাধারণের গণতান্ত্রিক দাবী ও অধিকারকে গলা টিপিয়া ধরিতেছেন এবং দুনিয়ার উপর মার্কিণ ডলারের একাধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করিতেছেন। ইহার জন্য আর একটা মহাযুদ্ধের আয়োজনও চলিয়াছে দ্রুতবেগে—হিটলারী দল নূতন ছদ্মবেশে নিউইয়র্ক, লণ্ডন ও টোকিওতে দেখা দিয়াছে!

মহাযুদ্ধের মিত্রগণ আজ এভাবে স্বার্থ ও মতবাদের দ্বন্দ্বে পরস্পরের শত্রুরূপে পরিগণিত হইয়াছেন, যাহা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এত অশান্তি ডাকিয়া আনিয়াছে। কারণ, যুদ্ধকালীন মৈত্রী রাজনৈতিক মতবাদ ও আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিল না, ছিল নিতান্তই সামরিক প্রয়োজনে।

যুদ্ধোত্তর নীতির মূলকথা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে বিরোধ সুরু হইয়াছে, যার মূলে রহিয়াছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা। কিন্তু মার্কিণ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌গণের মতে একমাত্র 'সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদ' ইহার জন্য দায়ী। মার্কিণ সিনেটের পররাষ্ট্র সম্পর্কিত কমিটির চেয়ারম্যান যুদ্ধোত্তর আমেরিকার মূলনীতি বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"We must always remember that the core of every major world problem to-day is Soviet Russia. If we can solve the problem of Russia, solutions to our other difficulties will follow almost automatically. We must not be diverted from the central fact."—অর্থাৎ আমেরিকার মতে আজিকার পৃথিবীতে যত বৃহৎ সমস্যা আছে, তার প্রত্যেকটির মর্মকেন্দ্রেই রহিয়াছে সোভিয়েট রাশিয়া। সুতরাং রাশিয়ার সমস্যা মীমাংসা করিতে পারিলেই অন্যান্য সমস্যা আপনা হইতে মিটিয়া যাইবে, এই মূল কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। ১৯৪৫ সাল হইতেই রাশিয়া সম্পর্কে আমেরিকার এই মনোভাবের সুরু। মনে রাখা দরকার ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে মাত্র মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছিল এবং পরের মাসে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে লণ্ডনে প্রথম পররাষ্ট্র মন্ত্রী পরিষদের (Council of Foreign Ministers) অধিবেশন হইয়াছিল। পটসডাম-চুক্তি অনুসারে আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স এবং চীন—এই পঞ্চশক্তির বৈদেশিক মন্ত্রীদের বৈঠক বসিয়াছিল এবং সেই প্রথম বৈঠকেই প্রথম মতভেদ সুরু হইল ইতালী, বলকান রাষ্ট্রসমূহ এবং ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে শান্তি-সন্ধি আলোচনায় ফ্রান্স ও চীনের অধিকার লইয়া। অথচ ফ্রান্স ও জাতীয়তাবাদী চীন বৃহৎ মিত্রশক্তির অন্তর্গত এবং রাশিয়া কর্তৃক স্বীকৃত ছিল। কিন্তু সোভিয়েট পররাষ্ট্র-সচিব মলোটভ এবং মার্কিণ পররাষ্ট্র-সচিব বার্ণেস একমত হইতে পারিলেন না এবং আপোষরফায়ও পৌঁছিলেন না। ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম বৈঠকেই মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট রাশিয়া সম্পর্কে 'No appeasement' পলিসি গ্রহণ করিলেন। সেই তারিখ হইতে আজ কোরিয়া পর্যন্ত গত পাঁচ বৎসর যাবৎ এই 'তোষণনীতি-বিরোধী' পররাষ্ট্রীয় নীতিই আমেরিকা অনুসরণ করিয়া আসিতেছে সোভিয়েট দুনিয়া সম্পর্কে। ইহা দ্বারা যুদ্ধকালীন সহযোগিতার

নীতি পরিত্যক্ত হইল এবং পিছনে পড়িয়া রহিল 'তেহরাণ, ইয়াল্টা ও পটসডাম চুক্তির যুগ'। কিন্তু ইহার ফলে রাশিয়ার শক্তি কি দিন দিন ক্ষয় পাইয়া গেল?— না, মোটেই না। কারণ, আমেরিকানরা নিজেরাই বলিতেছেন,—"Since 1945 the Soviet Union has taken some $7\frac{1}{2}$ million square miles of new territory and more than 500 million people under its control. It is now trying to extend its empire across Asia."

১৯৪৫ সাল হইতে সোভিয়েট ইউনিয়ন ৭৫ লক্ষ বর্গ মাইলের অধিক নূতন ভূমি এবং ৫০ কোটির অধিক লোক নিজেদের অধিকারের মধ্যে আনিয়াছে। এক্ষণে এই সাম্রাজ্য তাহারা এশিয়া মহাদেশের উপর বিস্তার করিতে চাহে। আমেরিকার মতে সোভিয়েটের খপ্পরে পড়িয়া এস্থোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া এই তিনটি রাজ্য লুপ্ত হইয়াছে এবং পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া রাশিয়ার অধীনে তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। মহাচীনেরও অনুরূপ দশা। ৪৫ কোটি লোক অধ্যুষিত চীন কমিউনিষ্ট রাশিয়ার আওতায় আসিয়া আমেরিকার একান্ত বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধোত্তর রাশিয়া এশিয়া মহাদেশে সবচেয়ে বড় জয় অর্জন করিয়াছে। ফলে সোভিয়েট সাম্রাজ্যের চেহারা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে?...

"Soviet Communism has now the chance to consolidate a vast contiguous area extending from the river Elbe in Germany to the China Sea, with more than 700,000,000 persons and immeasurable natural resources." ইউরোপে জার্মাণীর এল্‌ব্‌ নদীতট হইতে এশিয়ায় চীনা উপসাগরের উপকূল পর্যন্ত এই বিরাট ভূখণ্ডে সোভিয়েট শক্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং এই অবিচ্ছিন্ন মহাভূমিখণ্ডে সোভিয়েট কমিউনিজমের সংহত হইবার সুযোগ রহিয়াছে। এই বিরাট অঞ্চলে ৭০ কোটি লোকের বাস এবং ইহার প্রাকৃতিক সম্পদ অপরিমিত। সুতরাং অবস্থাটা কল্পনা করিবার মত। এবং রাশিয়া যদি বাধা না পায়, তবে কি হইবে? মার্কিণ রাষ্ট্রনেতারা বলিতেছেন যে, এখনও এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে ৬০ কোটি লোক রহিয়াছে, যাহাদের উপর সোভিয়েট কমিউনিজম আজও প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে নাই, কিন্তু সেই সম্ভাবনা আছে এবং যদি তাহা ঘটে— "If it should win this further area, or any substantial part of it, then Soviet Communism would control considerably more than half of the total population of the world."...

—তবে, গোটা পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী সোভিয়েট সাম্য-বাদের আওতায় চলিয়া যাইবে। আমেরিকা নিশ্চয়ই এই অবস্থা স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। কারণ যেখানে রাশিয়া ঢুকিয়াছে, সেখানেই "স্বাধীনতা নষ্ট, সভ্যতা বিপন্ন এবং পুলিশী রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে"।

গত ১৭৫ বৎসর যাবৎ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিবার পর আন্তর্জাতিক শান্তি, ব্যক্তিস্বাধীনতা, জীবনযাত্রার উন্নতি ইত্যাদি নীতি স্বদেশে ও বিদেশে অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের পথে বাহিরের চাপের জন্য মাঝে মাঝে বিভ্রাটও ঘটিয়াছে। এজন্য ঊনবিংশ শতকে একটা 'Monroe Doctrine' প্রচার করিতে হইয়াছিল, যাহা দ্বারা প্রেসিডেণ্ট মনরো ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, আমেরিকা একমাত্র আমেরিকানদের জন্য, ইউরোপের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সে হস্তক্ষেপ করিবে না এবং ইউরোপও যেন আমেরিকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মাথা ঘামাইতে না আসে। ইহার ফলে আমেরিকা পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে 'Policy of Isolation' বা 'নির্লিপ্ততার নীতি' অনুসরণ করিয়াছিল। প্রায় শতবর্ষ ধরিয়া 'মনরো মতবাদ'-সঞ্জাত নির্লিপ্ততার নীতি অনুসরণের পর উহা বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের বিপাকে পড়িয়া পরিত্যক্ত হইল, যদিও 'নির্লিপ্ততাপন্থীদের' সংখ্যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও কম ছিল না। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের 'Monroe Doctrine' বিংশ শতকে পরিবর্তিত হইতে হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে (১২ই মার্চ) প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের হাতে 'Truman Doctrine'-য়ে পরিণতি লাভ করিল, যাহা দ্বারা আমেরিকা আজ আন্তর্জাতিক জগতের প্রায় সর্বত্র জড়াইয়া পড়িয়াছে। কেন?—ইহার জবাব পাওয়া যাইবে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যখন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট উইলসন ঘোষণা করিয়াছিলেন,—

"We are participants, whether we would or not, in the life of the world. The interests of all nations are our own also. We are partners with the rest. What affects mankind is inevitably our affair as well as the affair of Europe and Asia."

আজিকার পৃথিবীতে সমস্ত জাতির ভাগ্য পরস্পরের সঙ্গে বিজড়িত। সুতরাং আমেরিকার পক্ষে নির্লিপ্ত থাকা আর সম্ভব নহে। কিন্তু মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের মতে মানুষের শান্তি, স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি আক্রমণশীল সোভিয়েট

কমিউনিজমের পাল্লায় পড়িয়া নষ্ট হইতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ১৯৪৫'এর শেষভাগ হইতে ১৯৪৬, ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালের ঘটনাবলী (অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, গ্রীস, তুরস্ক, ইরাণ এবং জার্মাণী, ফ্রান্স ইত্যাদি) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিল। ফলে, সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যদান হইতে সুরু করিয়া রাশিয়ার প্রতি প্রকাশ্য বিরোধিতার নীতি অনুসরণ করিতে হইল। গোড়ায় এই নীতি ছিল কমিউনিজমকে নির্দিষ্ট এলাকায় 'আটক রাখা'; এক্ষণে উহা দাঁড়াইয়াছে 'প্রতিদ্বন্দ্বিতার' মধ্যে—জেনারেল ব্রাডলি বলিতেছেন, "Our foreign policy has now shifted from containment to contesting Communism.' —কারণ প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের মতে 'স্বাধীন জাতিসমূহের উপর প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ আক্রমণের দ্বারা জোরপূর্বক সামগ্রিক রাষ্ট্রবিধানের অত্যাচার চাপাইয়া দিলে আন্তর্জাতিক শান্তির ভিত্তি ক্ষয় পাইয়া যাইবে এবং ফলে আমেরিকার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবে।' সুতরাং পৃথিবীর যেখানে যত স্বাধীন জাতি এই ধরণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছেন, তাঁহারা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছ হইতে সামরিক ও অর্থ-নৈতিক সাহায্য পাইবার অধিকারী। প্রথমতঃ গ্রীস এবং তুরস্ককে উপলক্ষ্য করিয়াই এই 'Truman Doctrine' ঘোষিত হইয়াছিল, যাহা ক্রমে ক্রমে ইউরোপ ও এশিয়ার বহুস্থানে প্রযোজ্য হইয়াছে। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম গ্রীক গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ১৩ হাজার গ্রীক কমিউনিষ্ট সৈন্য গ্রীসের উত্তর দিক হইতে গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করে। আর ১৯৪৫ সালের শেষভাগে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন যে, তুরস্কের সহিত তাঁহাদের যে ২০ বৎসরের বন্ধুতার সন্ধি ছিল, তাহা বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইবে। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট দার্দানেলিস প্রণালীর উপর তুরস্কের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ ও সামরিক অধিকার দাবী করেন। পরে পূর্ব তুরস্কের দুইটি বড় প্রদেশের উপরও রাশিয়ার পুরানো অধিকার দাবী করা হইয়াছিল।)

এভাবে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্যদানের মূল কথা হইতেছে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত এলাকাগুলিকে "শক্তিশালী" করিয়া তোলা। কারণ মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট লক্ষ্য করিয়াছেন যে, 'শক্তিশালী এলাকায়' কমিউনিজমের আক্রমণ ও অনুপ্রবেশ সফল হইতে পারে না। অপর পক্ষে "দুর্বল স্থানে" প্রবেশ ও আঘাত হানাই কমিউনিষ্টদের সহজ কৌশল। সুতরাং 'Situations of weakness'-কে মার্কিন গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের অনুসৃত অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, শিল্পগত সাহায্য এবং সৈন্য ও সমর-সম্ভারের সহায়তার দ্বারা 'Situations of strength'-য়ে

পরিণত করিতে চাহেন। এই নীতিরই অভিব্যক্তি দেখা যাইতেছে প্রথমতঃ শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে ইউ-এন-ও মারফৎ কাজ করা এবং ঋণ ও ইজারা, মার্শাল প্ল্যান ও 'পয়েণ্ট ফোর প্রোগ্রামের' (চতুর্থ নং কর্মপদ্ধতি, যাহার প্রধান উদ্দেশ্য টেক্‌নিক্যাল সাহায্যদান) কার্যাবলীর মধ্যে।

কিন্তু মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট দাবী করিতেছেন যে, কেবল সোভিয়েট কমিউনিজমকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহাদের আসল লক্ষ্য আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌভ্রাত্র রক্ষা, আইন ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা এবং সমগ্র মনুষ্যজাতির মঙ্গলবিধান ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা। অর্থাৎ এক কথায় দুনিয়াব্যাপী 'সামগ্রিক শান্তি' ('Total peace'—'Total war' নয়!) গড়িয়া তোলা। এজন্য বলা যাইতে পারে যে, বর্তমান মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতি ৬টি মূল বিষয়ের উপর দাঁড়াইয়া আছে। যথা—

(১) রাষ্ট্রসংঘ বা ইউ-এন-ও'কে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতে ও সর্বতোভাবে শক্তিশালী করিতে হইবে।

(২) স্বাধীন জাতিসমূহের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে পারস্পরিক আত্মরক্ষার জন্য এবং ইউ-এন-ও'র প্রতি দায়িত্ব পালন ও বিভিন্ন আঞ্চলিক চুক্তি পালনের জন্য।

(৩) বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রগুলিকে অর্থনৈতিক ও টেক্‌নিক্যাল সাহায্য দিতে হইবে—জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও সাম্যবাদ প্রতিরোধের জন্য।

(৪) মৌলিক মানবিক অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদার প্রতিষ্ঠা দিতে হইবে।

(৫) গণতান্ত্রিক জীবনধারাই যে সর্বোৎকৃষ্ট, এই তথ্য ও সত্য প্রচার করিতে হইবে এবং

(৬) বর্তমান দুনিয়ার প্রত্যেকটি বৃহৎ সমস্যার মূলেই রহিয়াছে সোভিয়েট রাশিয়া, এই কথা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

মার্কিণ সিনেটের পররাষ্ট্র-কমিটির রিপোর্ট হইতে আমরা এই মূল বক্তব্যগুলি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিলাম, যাহা দ্বারা আধুনিক জগতের ঘটনাবলীর মার্কিণী ভাষ্য স্পষ্ট বুঝা যাইবে। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান যে নূতন মতবাদ বা 'Truman Doctrine' প্রচার করিতেছেন, যুদ্ধোত্তর জগতে উহার একদিকে লক্ষ্য আক্রমণশীল কমিউনিজমের গতিরোধ এবং অন্যদিকে সামগ্রিক শান্তির প্রতিষ্ঠা।

"যুদ্ধও নয়, শান্তিও নয়!"

সোভিয়েট-মার্কিণ বিরোধের ফলে যেভাবে আন্তর্জাতিক জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে কিছু কিছু অভিনব অবস্থারও আমরা সন্ধান পাইতেছি, যাহা ইতিপূর্বে ইতিহাসে কখনও প্রত্যক্ষ করা যায় নাই। ইহার মধ্যে 'Cold War' বা 'ঠাণ্ডা লড়াই' শব্দ হিসাবে যেমন বিচিত্র, তেমনই এক অভিনব পরিস্থিতিরও ইহা তাপনির্দেশক যন্ত্রের মত। ১৯৪৮ সালে জার্মাণীর রাজধানী 'বার্লিন অবরোধ' উপলক্ষে এই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অভিনব উত্তেজনা দেখা দিয়াছিল, যখন হাতে-কলমে যুদ্ধ ছিল না, অথচ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যুদ্ধের অনুরূপ হাওয়া ছিল। অবশ্য আজও ঠাণ্ডা লড়াই চলিতেছে (এবং কোরিয়ায় চলিতেছে 'গরম যুদ্ধ'), কিন্তু বার্লিনে আগের মত আর তীব্রতা নাই। জার্মাণী যেমন পূর্বে ও পশ্চিমে বিভক্ত এবং পশ্চিমাংশ আবার মার্কিণ, বৃটিশ ও ফরাসী এলাকায় খণ্ডিত, খাস বার্লিন সহরও তাহাই এবং ইহাও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবদান। বার্লিনের এই খণ্ডিত অংশগুলির সঙ্গে পূর্বাংশের যে যোগাযোগ ছিল, উহার চাবিকাঠি ছিল সোভিয়েট এলাকায়, অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলে। রেল, রাস্তা ও খাল ইত্যাদির সংযোগে সহরের পশ্চিমাংশে যে সমস্ত সরবরাহ আসিত, উহার মর্মকেন্দ্র ছিল পূর্বখণ্ডে সোভিয়েটের হাতে। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিমের রাজনৈতিক বিরোধের ফলে সোভিয়েট পক্ষ যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দেন। ফলে, পশ্চিম বার্লিনে কেবল অচল অবস্থার উদ্ভব হইল না, জ্বালানি ও খাদ্য-দ্রব্যের অভাবে ২৫ লক্ষ নাগরিকের জীবনও বিপন্ন হইল। ইংগ-মার্কিণ পক্ষ অবশ্য বিমানযোগে সরবরাহ দিয়া এক বিস্ময়কর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু এই নিদারুণ অবস্থার জন্য রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে লড়াই লাগিবার উপক্রম হইয়াছিল। ১৯৪৮ সালের বসন্তকালে বার্লিনের এই সংকটের আরম্ভ এবং প্রায় এক বৎসর, বহু টানা-হেঁচড়া ও আন্দোলনের পর ১৯৪৯ সালের বসন্তকালে (১২ই মে) ইহার অবসান ঘটে। বিশেষভাবে এই সময়টাই ছিল 'ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগ'! ঠাণ্ডা লড়াই গরম লড়াইতে পরিণত হইবে কিনা, তাহাই ছিল সেদিন বহু লোকের উৎকণ্ঠার বিষয়।

কিন্তু কেন এই প্রকার অবস্থা দেখা দেয়? মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারকগণ ইহার একটা অভিনব জবাব দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন, যাহা আমাদের দেশের সংবাদপত্রে কখনও শুনা যায় নাই, কিম্বা আলোচনা হইয়াছে

বলিয়া আমাদের মনে পড়ে না। তাঁহারা বলিতেছেন যে, অ-কমিউনিষ্ট দেশগুলির অধিকাংশই সাধারণতঃ এই থিওরী বা তত্ত্ব অনুসারে চলেন যে, হয় তাঁহারা যুদ্ধ, নয় তাঁহারা শান্তির অবস্থায় আছেন। মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্রীয় এবং অন্যান্য বিভাগ শান্তির জন্য সংগঠিত, দুনিয়ার অন্যান্য দেশ সম্পর্কে তাঁহারা সেইভাবেই চলেন। যদি যুদ্ধ বাধে, তবে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় এবং দেশরক্ষা-দপ্তরের উপর দায়িত্ব পড়ে এবং হাতে-কলমে যুদ্ধ চলিতে থাকে। কিন্তু সোভিয়েট কমিউনিজম একটা মধ্যবর্তী অবস্থা—যুদ্ধ ও শান্তির একটা অস্পষ্ট এলাকা আবিষ্কার করিয়াছে।

'The Soviet Communism has invented an intermediate stage, a twilight zone between war and peace' এবং এই অবস্থাটার নাম হইতেছে—'Not war, not peace' —অর্থাৎ যুদ্ধও নয়, শান্তিও নয়। সোভিয়েট বিপ্লবের সময় ব্রেষ্ট-লিটোভস্ক সহরের যে সন্ধির দ্বারা (৩রা মার্চ, ১৯১৮) সেদিনের জার্মাণী ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধের অবসান হইয়াছিল, প্রকাশ যে, ট্রট্স্কি সেই সন্ধির সম্পর্কেই 'Not war, not peace,' এই বিচিত্র তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ মানুষ যুদ্ধ বোঝে কিম্বা শান্তি বোঝে। কিন্তু 'যুদ্ধও নয়, শান্তিও নয়', এমন অদ্ভুত অবস্থার তাল পাওয়া কঠিন। ফলে, ধনবান ও শক্তিমান আমেরিকা এই গোলকধাঁধায় পড়িয়াছেন—তাঁহারা শান্তির জন্য তৈয়ারী হইবেন, না যুদ্ধের জন্য? অথচ এদিকে—'We are devoting billions in money and our highest talent to preparation for a fighting war—a war that may never come' যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হইতেছে এবং বড় বড় মস্তিষ্ক খাটিতেছে অথচ যুদ্ধ নাও বাধিতে পারে। জন ফষ্টার ডুলেসের মত মাতব্বরও স্বীকার করিতেছেন যে, তাঁহারা এই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় হতবুদ্ধি হইয়াছেন। কারণ,

"When the world thermometer registers, 'Not war, not peace', it is hard to decide whether to follow military judgments or political judgments." সামরিক বা রাজনৈতিক, কোন্ বিচার-বুদ্ধি দ্বারা চলিতে হইবে, আমেরিকা তাহার ঠাহর পাইতেছে না। কারণ, বর্তমান অবস্থা যুদ্ধও নয়, শান্তিও নয়!

আন্তর্জাতিক অবস্থার এই বিভ্রান্তির জন্য আমেরিকাকে দুই ফ্রণ্টেই নজর দিতে হইতেছে—সংগঠন ও সংগ্রাম। কারণ, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আবহাওয়ায়

আন্তর্জাতিক জগতে যে কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি হইয়াছে, উহার মধ্যে সুদিনের সূর্যের মুখ দেখা যাইতেছে না। ফলে, ইউরোপ ও এশিয়ার কতকগুলি এলাকার জন্য আমেরিকাকে কোটি কোটি টাকা খরচ করিতে হইতেছে যুদ্ধবিধ্বস্ত জনসমাজের পুনর্গঠনের জন্য কিম্বা সর্বাঙ্গীণ পুনর্বসতির জন্য—যাহাতে রাজনীতির দিক দিয়া তাহারা কমিউনিজমের খর্পরে না পড়ে। আর সেই সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য সামরিক আয়োজনও করিতে হইতেছে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের দ্বারা এবং এ কারণেই প্রতি বৎসর আমেরিকার সামরিক বাজেট অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইতেছে। অর্থনৈতিক ও সামরিক উভয় দিক দিয়া শক্তিশালী না হইলে আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট এই সমস্ত দেশ সোভিয়েট সাম্যবাদের আক্রমণ ও অগ্রগতি রোধ করিবে কিরূপে?

কিন্তু যুদ্ধও নয়, শান্তিও নয়, এই যখন দুনিয়ার অবস্থা, তখন সোভিয়েট রাশিয়া বাহ্যতঃ আমেরিকার মত উত্তেজিত, উদ্বিগ্ন এবং রণকোলাহলমুখর নয় কেন? বরং রাশিয়া 'ষ্টকহোম শান্তি আন্দোলনের' দ্বারা সারা পৃথিবীতে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব গড়িতেছে কেন এবং কেনই বা আমেরিকাকে যুদ্ধবিলাসী নয়া ফ্যাসিষ্টরূপে চিত্রিত করিতেছে?—মার্কিণ রাজনীতিবিদ্‌গণ ইহার দুই প্রকার ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রথমতঃ, ষ্টকহোম শান্তি আন্দোলন একটা বিরাট রাজনৈতিক ধাপ্পা মাত্র। আসলে সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক সংগঠন এখনও প্রভূত শক্তিশালী, বিশাল সৈন্যবাহিনী তাহাদের প্রস্তুত রহিয়াছে—অনুমান ২০০ ডিভিসনের কম নহে—এবং সেই অনুযায়ী ট্যাঙ্ক ও এরোপ্লেন। (গত ২৬শে জানুয়ারী বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ এট্‌লি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"রাশিয়ার কার্যকলাপ দেখিয়া এই আশঙ্কাই হয় যে, যথেষ্ট সামরিক বল না থাকার জন্য বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে বিশেষ বিপদে পড়িতে হইবে। গোলন্দাজ বাহিনী এবং পঁচিশ হাজার ট্যাঙ্ক সহ রাশিয়ার মোট ১৭৫ ডিভিসন সৈন্য আছে। সব সময়ের জন্য তাহাদের ২৮ লক্ষ সশস্ত্র সৈন্য মোতায়েন, ইহার উপর তাহারা প্রয়োজনমত আরও ২৮ লক্ষ সৈন্যকে সশস্ত্র করিতে পারে। প্রায় কুড়ি হাজার বিমান লইয়া রাশিয়ার বিমানবহর গঠিত আর বিশ্বের মধ্যে রাশিয়ারই সর্বাধিক সাবমেরিন আছে। অথচ রাশিয়ার আক্রান্ত হইবার কোন আশঙ্কা নাই")। তথাপি আমেরিকা ও 'স্বাধীন জগতের' বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার মত প্রস্তুতি এখনও তাহার সম্পূর্ণ হয় নাই—বিগত মহাযুদ্ধের ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতেই তাহারা ব্যতিব্যস্ত। এশিয়াতে

নূতন চীন এবং ইউরোপে রণক্ষত রাশিয়া, এই দুইয়ের পুনর্গঠন সমস্যায় আরও দীর্ঘকাল লাগিবে। সুতরাং ইতিমধ্যে শান্তি আন্দোলনের দ্বারা জনসাধারণ ও বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্টকে ভুলাইয়া রাখা তাহাদের প্রয়োজন। কিন্তু যখন তাহারা প্রস্তুত হইবে, তখন প্রয়োজনমত পশ্চিম ইউরোপে, মধ্যপ্রাচ্যে কিংবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাহারা আঘাত হানিবে। এই সম্ভাবনার জন্যই আমেরিকা অলস থাকিতে পারে না এবং রাশিয়ার শান্তি আন্দোলনেও বিশ্বাস করে না।

দ্বিতীয়তঃ, অহিংসা ও শান্তিবাদ কমিউনিজমের মধ্যে নাই, উহা মূলতঃ সশস্ত্র সংগ্রামে ও বলপ্রয়োগে বিশ্বাসী। সুতরাং উহার নীতি ও পদ্ধতির মধ্যে 'শান্তিপূর্ণ উপায়' বলিয়া কোন বস্তু নাই। তথাপি হিটলারী ফ্যাসিজমের সংগে উহার মূলগত একটা প্রকাণ্ড বিভেদ আছে, যাহা মনে রাখিবার মত। হিটলার জার্মাণ জাতির শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করিতেন এবং একমাত্র জার্মাণরাই দুনিয়ার উপর শাসনের অধিকারী এই ধারণা নাৎসী নায়কদের ছিল। ফলে, এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠা দিতে হইলে অপর জাতিকে যুদ্ধের দ্বারা পরাজিত করিয়া আপনাদের বশে আনা প্রয়োজন। কিন্তু সোভিয়েট কমিউনিজমের মধ্যে এই জাতিগত শ্রেষ্ঠতার অভিমান নাই এবং 'জাতীয় যুদ্ধ' বা National warয়েও তাহাদের বিশ্বাস নাই বরং 'জাতীয় যুদ্ধ'কে তাহারা 'আন্তর্জাতিক মানবিকতা'র ও 'জনগণের প্রগতি'র বিরোধী বলিয়া মনে করে। জাতীয়তার মূলে শ্রেণী-আভিজাত্যের প্রেরণা আছে বলিয়া, উহাকে তাহারা এড়াইয়া চলিতে চাহে। সুতরাং 'জাতীয় সংগ্রামে'র বদলে 'শ্রেণী-সংগ্রাম'ই তাহাদের লক্ষ্য। প্রত্যেক দেশে শ্রেণী-সংগ্রাম ও শ্রেণী-বিদ্বেষ উস্কাইয়া দিয়া সেই দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে ধ্বংস ও কমিউনিষ্টদের করতলগত করাই আন্তর্জাতিক সাম্যবাদিগণের লক্ষ্য। এই মতবাদের মার্কিণ ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, বর্তমান যুগোশ্লাভিয়ায় জাতীয়তার জাগরণ দেখিয়া সোভিয়েট সাম্যবাদ আরও সাবধান হইয়াছে। সুতরাং......

"It avoids anything that suggests a war of nation against nation, because it may arouse national loyalties which are stronger than class loyalties. War between nations and war between classes are two different kinds of war that do not go readily hand in hand. Communism is committed primarily to class war."

সুতরাং শ্রেণী-সংগ্রামের দ্বারা অভীষ্ট-সিদ্ধিই যাহাদের প্রধান লক্ষ্য, তাহারা 'জাতীয় সংগ্রাম' চাহিবে কেন? এবং এজন্যই বাহ্যিক শান্তি আন্দোলনের দ্বারা তাহারা এত যুদ্ধবিরোধী প্রচারকার্য করিতেছে। কিন্তু গৃহযুদ্ধ বা শ্রেণী-সংগ্রামের বিরুদ্ধে তাহারা টুঁ শব্দটি করে না, এই দিক দিয়া তাহারা একান্ত নীরব। কারণ, তাহারা জানে যে, শ্রেণী-সংগ্রামের হাতিয়ার দিয়াই তাহারা বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্টকে ঘায়েল করিতে পারিবে। মিঃ ডুলেস বলিতেছেন,—

"The effectiveness of these methods is shown by the fact that communism, through governments, political parties and labour unions, now has dominant influence over about one-third of the entire human race !"

অতএব রাশিয়ার পক্ষে বাহ্যিক শান্তি আন্দোলন তো লাভের কথা! কারণ, 'জাতীয় যুদ্ধ' ছাড়াই তাহারা সমগ্র মনুষ্য-সমাজের এক-তৃতীয়াংশের উপর প্রভাব খাটাইতেছে বিভিন্ন গভর্ণমেন্ট, রাজনৈতিক দল ও শ্রমিক সংগঠনগুলির মারফৎ। লেনিন বলিয়াছেন যে, ১৯১৮ সালের ব্রেষ্ট-লিটোভস্ক শান্তি-সন্ধির দ্বারা সোভিয়েট বিপ্লব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ পাইয়াছিল। সুতরাং আজও যে ষ্টকহোম শান্তি আন্দোলনের পিছনে সোভিয়েট সাম্যবাদের সেই বৃহত্তর প্রস্তুতির কৌশল নাই, এমন নিশ্চয়তা কে দিবে? বিশেষতঃ লেনিনের মতে, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রবাদের সঙ্গে সোভিয়েট সাম্যবাদের সংঘর্ষ যখন অনিবার্য এবং আমেরিকাকে যখন পয়লা নম্বরের ধনতন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদী শত্রুরূপে প্রচার করা হইতেছে, তখন মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিবেন কিরূপে? অতএব বাধ্য হইয়াই আমেরিকাকে আত্মরক্ষার জন্য বিপুল সামরিক আয়োজন এবং ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে। সোভিয়েট রাশিয়া এই দিক দিয়া সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। একরূপ সুসংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ গোঁড়া বা fanatic কমিউনিষ্ট পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই রহিয়াছে এবং তাহারা সুযোগ মত সেই দেশের গভর্ণমেণ্ট ও রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে রাশিয়ার সহিত হাত বাড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং জাতীয় যুদ্ধের প্রয়োজন ইহাদের নাই, বরং শ্রেণী-সংগ্রাম গৃহযুদ্ধের পক্ষে এই প্রকার যুদ্ধ অত্যন্ত ক্ষতিকর। অতএব আমেরিকার মতে, স্টকহোম রাশিয়ার যুদ্ধবিরোধী কিম্বা শান্তি আন্দোলন একটা রাজনৈতিক ধাপ্পা মাত্র, যাহার উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট বিপ্লবের আয়োজনকে আড়াল করিয়া রাখা এবং সরল বিশ্বাসী জনগণকে,

বিশেষভাবে উদার মতাবলম্বী বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকগণকে, বিভ্রান্ত করা। যদি আমেরিকা বুঝিতে পারিত যে, কোন প্রকার যুদ্ধ ও অশান্তিতে সোভিয়েট সাম্যবাদের রুচি নাই, তাহা হইলে মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু অতীত ইতিহাস এবং ১৯৪৫—৫০'এর কার্যাবলী হইতে আমেরিকা তেমন কোন প্রমাণ পাইতেছে না। • বরং 'যুদ্ধও নয়, শান্তিও নয়'—এই অভিনব অবস্থা রাশিয়ারই সৃষ্টি এবং ইহার জন্য আমেরিকাকে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকিতে হইতেছে—যাহার জন্য আমেরিকার যুদ্ধায়োজন এত স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

পররাষ্ট্রনীতিতে সামরিক প্রভাব

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি নিঃসন্দেহে যুধ্যমান বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে এবং যদিও কোন দেশের পররাষ্ট্রনীতি আভ্যন্তরীণ স্বদেশীয় নীতি হইতে বিচ্ছিন্ন নহে,—এবং এই স্বদেশীয় নীতি হইতেছে সমুদ্রপারের বিভিন্ন দেশের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কাজ-কারবারের দ্বারা জাতীয় সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য বজায় রাখা এবং বৃদ্ধি করা (যেমন গত দেড়শত বৎসরের বৃটেন সম্পর্কে আমরা বিশেষভাবে ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছি),—তথাপি ইহা মুখ্যতঃ আর একটি বৃহৎ প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত এবং এই প্রশ্ন হইতেছে সামরিক। কারণ, ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে, প্রকাণ্ড সামরিক বলের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকিলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে বৈদেশিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের অখণ্ড প্রতাপ বজায় রাখা যায় না। এজন্যই পররাষ্ট্রীয় নীতি সাধারণতঃ বাণিজ্য-নীতি ও রণ-নীতির সহিত হাত-ধরাধরি করিয়া চলে। গত প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত আমরা একদিকে বৃটেন ও ফ্রান্সকে এবং অন্য দিকে আমেরিকা ও জাপানকে এই নীতি অনুসরণ করিতে দেখিয়াছি, যাহার সঙ্গে কাইজারের ও হিটলারের জার্মাণী দুইবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিয়া দুনিয়া-ব্যাপী বিভ্রাট বাধাইয়াছে। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, পররাষ্ট্রীয় নীতিকে বাণিজ্য-নীতি ও রণ-নীতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা একান্ত কঠিন। তথাপি লক্ষ্য করিবার এই যে, যে-কোন দেশের পররাষ্ট্রীয় নীতিই একমাত্র সেই দেশের অ-সামরিক গভর্ণমেণ্টেরই বিবেচ্য বিষয়—যাহার সঙ্গে বাহ্যতঃ যুদ্ধবিশেষজ্ঞ ও বাণিজ্যবিশেষজ্ঞদের যোগ নাই। অর্থাৎ কোন বণিক বা সেনাপতি পররাষ্ট্র-

নীতি সম্পর্কে সাধারণতঃ পরামর্শ দেন না, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভা বা গভর্ণমেণ্টই এই নীতি নির্ধারণ করিয়া থাকেন জাতীয় কল্যাণ ও উন্নতির জন্য। মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট দাবী করিতেছেন যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রাধান্য কিম্বা সামরিক প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করিতেছেন না, করিতেছেন পৃথিবীর শান্তি ও সৌভ্রাত্র রক্ষার জন্য এবং কমিউনিষ্ট উৎপাত হইতে বিপন্ন মনুষ্য-সমাজকে ত্রাণের জন্য। যদি ইহার জন্য আত্মরক্ষার শক্তি সঞ্চয় করিতে গিয়া তাঁহাদের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতি রণনীতিপ্রধান বলিয়া মনে হয়, তবে উপায় কি?

কিন্তু বড় বড় মার্কিণ রণনীতিবিদ্ ও রাজনীতিবিদ্ এই পর্যন্ত যাহা কিছু বলিতেছেন এবং করিতেছেন, সেগুলি লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি সংগঠিত হইতেছে মূলতঃ মার্কিণ সমর-বিভাগের দ্বারা। ইহা অত্যন্ত অভিনব, সন্দেহ নাই। কেননা, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র বা সংবিধান অনুসারে স্বয়ং প্রেসিডেণ্টই আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ ও অনুসরণের পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। জনসাধারণের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিরূপে তিনিই ইহার জন্য দায়ী। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট ওয়াশিংটন টমাস জেফারসনকে তাঁহার প্রথম সেক্রেটারী অব ষ্টেট (বর্তমানে যে পদ পররাষ্ট্র-সচিবরূপে আমাদের দেশে পরিচিত) রূপে নিযুক্ত করেন। পররাষ্ট্রীয় নীতিতে প্রেসিডেণ্টকে উপদেশ দেওয়া ও তাঁহার এজেণ্ট হিসাবে কাজ করাই ছিল এই নিয়োগের প্রধান উদ্দেশ্য। আজও সেই নিয়মানুসারে ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট ও সেক্রেটারী অব ষ্টেট আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের দক্ষিণ হস্ত-রূপে কাজ করিবার জন্যই নিযুক্ত হইয়া থাকেন। মার্কিণ কংগ্রেসের উচ্চপরিষদ (সিনেট) ও নিম্নপরিষদ (হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস) রাষ্ট্রপতিকে এ বিষয়ে বহু দিক দিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন এবং নানাভাবে প্রভূত ক্ষমতাও খাটাইয়া থাকেন। কিন্তু ইহা মার্কিণ শাসনতন্ত্রের নিয়মপ্রণালী কিম্বা কংগ্রেসের আচার ও অনুষ্ঠানের কথা। আসলে বর্তমান মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতির গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণ করিতেছেন আমেরিকার সমর-বিভাগের কর্তা ও সামরিক নেতবৃন্দ। এই অবস্থার সহিত গত ত্রিংশ দশকের জাপানের অবস্থার বিস্ময়কর মিল আছে। (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপান কর্তৃক আমেরিকাকে আক্রমণের অন্যতম কারণও ছিল জাপানী গভর্ণমেণ্টের উপর সামরিক নেতাদের অনতিক্রমণীয় প্রভাব।) অবশ্য মার্কিণী কর্তারা কৈফিয়ৎ-স্বরূপ বলিতেছেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সামরিক সমস্যাই জীবন-মৃত্যুর মত গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল। ফলে, সমর-

বিভাগের দাবীই সর্বত্র অগ্রাধিকার বা Priority লাভ করিয়াছে এবং সেই সময় "সম্মিলিত সেনানীমণ্ডলী" যাহা বলিতেন, তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইত—একমাত্র স্বয়ং প্রেসিডেণ্টের অনুমোদনের প্রয়োজন হইত। যুদ্ধের অবসানেও এই সংগঠন রহিয়া গিয়াছে এবং আমেরিকা মনে করে না যে, শীঘ্র কোন শান্তির সম্ভাবনা আছে। ফলে, "সম্মিলিত সেনানীমণ্ডলী" ও "জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ" বর্তমান মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্রনীতির উপর বিপুল প্রভাব খাটাইতেছে। এই প্রভাব যে কত বড় তাহা স্বয়ং জন ফষ্টার ডুলেসের স্বীকারোক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। মিঃ ডুলেস বলিতেছেন,—

"The Joint Chiefs of Staff continue to have large part in making our foreign policy and the National Security Council is now a top policy-making body. It has been interposed between the State Department and the President. Until it was created the State Department was the President's 'right hand' in conducting foreign policy. Now the State Department is in many respects subordinated to the National Security Council in the field of foreign policy."

ইহার সোজা অর্থ এই যে, সেনানীমণ্ডলী ও জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ বা ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলই বর্তমান মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্রীয় নীতি বহুলাংশে গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করিতেছে এবং এই কাউন্সিলের গঠন মূলতঃ সামরিক। এমন কি, ইহা মিঃ একিসনের পররাষ্ট্রীয় দপ্তরের চেয়েও ক্ষমতাশালী এবং যদি এই নীতি ও পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে, দেখা যাইবে যে, ১৯৪৫ সাল হইতে আজ পর্যন্ত মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্রীয় নীতি হইতেছে রণনীতি ও সামরিক নীতিরই নামান্তর মাত্র। শান্তির সময়ে যে-কোন দেশের গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এই অবস্থা নিঃসন্দেহে অভাবনীয়।

১৯৪৫ সাল হইতে এই পররাষ্ট্রীয় নীতি গত পাঁচ বৎসর যাবৎ কিভাবে সামরিক নীতির সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে, তাহা কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া দেখান যাইতে পারেঃ—(১) বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও আমেরিকা, এই চারি শক্তি পরাজিত জার্মাণীকে দখল করিয়া আছে। এই চতুঃশক্তির মধ্যে একমাত্র আমেরিকা ছাড়া আর সকলেই ১৯৪৭ সালের মধ্যে তাহাদের স্ব স্ব অধিকৃত এলাকায় সামরিক শাসনের অবসান ঘটাইয়া অ-সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে শাসনভার অর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু আমেরিকা ১৯৪৯ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত

জার্মাণীতে মিলিটারী গভর্ণমেণ্ট বজায় রাখিয়াছিল। ইহার একমাত্র কারণ মার্কিণ পররাষ্ট্র-দপ্তরের সঙ্গে মার্কিণ সমর-দপ্তরের মতভেদ এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রাধান্য লাভ। মার্কিণ সেনাপতিরা জার্মাণ সৈন্য ও সেনাপতিদিগকে প্রশংসা ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এজন্য তাঁহারা ফ্রান্সের সঙ্গে মতভেদ ঘটাইয়াও জার্মাণীর সঙ্গে সহযোগিতা করিতে উৎসুক। এই মনোভাবের জন্যই আমেরিকার সমব-দপ্তর ফ্রান্সের চেয়েও পশ্চিম জার্মাণীর উপর অধিকতর নির্ভর করিতে চাহেন। (২) প্রশান্ত মহাসমুদ্রে জাপানী-অধিকৃত দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে মার্কিণ সেনাপতিরা এই বলিয়া জিদ প্রকাশ করিতে থাকেন যে, আমেরিকার আত্মরক্ষার জন্য এই দ্বীপগুলি মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের দখলে থাকা দরকার। মার্কিণ সমর-দপ্তরের এই মনোভাবের জন্য ইউ-এন-ও'র উপনিবেশ-সংক্রান্ত কর্ম-পদ্ধতি লইয়া মার্কিণ গভর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে। এই ক্ষেত্রেও সামরিক নীতিই প্রাধান্য অর্জন করিযাছে। (৩) দক্ষিণ বা ল্যাটিন আমেরিকার ঘাঁটিগুলি লইযাও সমর-দপ্তরের সহিত পররাষ্ট্রীয দপ্তরের যথেষ্ট মতবিরোধ ঘটিয়াছে। এই ঘাঁটিগুলি আমেরিকার আত্মবক্ষাব জন্য হাতে রাখা একান্ত প্রয়োজন, ইহাই ছিল সামরিক কর্তৃপক্ষের মত। এই উদ্দেশ্যে পানামার নৌঘাঁটিকে অধিকতর সুরক্ষিত ও সুসজ্জিত করিবার জন্য এক বিবাট ব্যযেব পবিকল্পনা হইয়াছিল এবং এক দীর্ঘস্থায়ী লীজের প্রস্তাব হইযাছিল। শেষ পর্যন্ত ইহা অবশ্য স্থগিত রহিযাছে। (৪) উত্তর আফ্রিকার লিবিয়াতে ইতালীয়দের যে সমস্ত উপনিবেশ ও ঘাঁটি ছিল, সেগুলি সম্পর্কেও মার্কিণ সমর-বিভাগ যথেষ্ট সোরগোল করিয়াছেন। এখানে অবশ্য অন্যতম দাবীদাব ও অংশীদাব ছিল বৃটেন। পরে সামরিক ও অ-সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে আপোষেব জন্য বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে একটি মীমাংসা হইযাছে। ইহাব মূল অবশ্য ছিল ইউ-এন-ও। (৫) উত্তর অতলান্তিক চুক্তিও গোড়াতে যেভাবে পরিকল্পিত হইযাছিল, পরে মার্কিণ সমর-দপ্তরের চাপে উহার পবিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে হইযাছে। গোড়াতে এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল প্রধানতঃ রাজনৈতিক এবং পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা আত্মরক্ষার শক্তি-বৃদ্ধি। এজন্য কানাডা, বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যান্ড, লাক্সেমবুর্গ ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—এই কয়টি রাষ্ট্রকে লইয়া চুক্তি-সম্পাদনের কথা ছিল। কিন্তু মার্কিণ সেনাপতিরা বাধা দেন। তাঁহারা বলেন যে, সামরিক ও রণনৈতিক সুবিধার জন্য কতকগুলি ঘাঁটির প্রয়োজন—যেমন, গ্রীণল্যান্ড, আইসল্যান্ড, এজোর্স দ্বীপ এবং আলপাইন গিরিসংকট। ফলে, প্রস্তাবিত রাজনৈতিক চুক্তির গন্ডি বাড়াইয়া সামরিক মৈত্রী ও সহযোগিতার মধ্যে প্রসারিত করিতে হইল এবং অনেকগুলি

অতিরিক্ত রাষ্ট্রকে উত্তর অতলান্তিক চুক্তির মধ্যে গ্রহণ করিতে হইল। ইহার জন্যও দায়ী মার্কিণ সমর-বিভাগ, যাঁহারা আফ্রিকা হইতে বহু দূরবর্তী জাপান পর্যন্ত একই নীতি অনুসরণ করিতেছেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের পূর্ববর্তী যুগে মার্কিণ পররাষ্ট্রীয় নীতির চেহারা ও চরিত্র এই প্রকারের সামরিক ছিল না। কিন্তু আজ সেনাপতি ও সমরবিশেষজ্ঞ-গণ সর্বত্র বিপুল প্রভাব খাটাইতেছেন, যাঁহারা কেবল ঘাঁটি, কামান-বন্দুক, এরোপ্লেন ও আণবিক বোমা দিয়া আধিপত্য বজায় বা "সম্ভাবিত শত্রুকে" ঘায়েল করিবার কথা চিন্তা করিতেছেন। ফলে, রণনীতির দাপটে রাজনীতি পশ্চাদপসরণ করিয়াছে, যাহার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ কোরিয়া এবং পূর্ব এশিয়া। চীন, কোরিয়া, ফরমোজা কিম্বা জাপানী ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ অথবা পশ্চিম ইউরোপ সম্পর্কে এ পর্যন্ত মার্কিণ সামরিক পুরুষগণ যে সমস্ত বিবৃতি, বক্তৃতা কিম্বা ভাষণ দিয়াছেন, সেগুলি একত্র করিলে এক মহাভারত রচিত হইবে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশের, এমন কি বৃটেন বা ফ্রান্সেরও রণনীতিবিদ্‌ ও সমরবিশেষজ্ঞ-গণের মতামত আমেরিকার রণনেতাগণের মত রাষ্ট্র-জীবনে এতটা প্রাধান্য অর্জন করে নাই। জেনারেল আইসেনহাওয়ার, জেনারেল ম্যাকআর্থার, জেনারেল ওমর ব্রাডলি, জেনারেল জর্জ মার্শাল প্রভৃতি আমেরিকার বহু খ্যাতনামা সামরিক পুরুষ আজ প্রতিদিনের সংবাদপত্রের স্তম্ভগুলি যেন দখল করিয়া আছেন। সময় সময় ইঁহাদের মতামত এমন মাত্রা ছাড়াইয়া যায় যে, স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকেও লজ্জা পাইতে হয়। পাঠকবর্গের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে, গত বৎসর কোরিয়া যুদ্ধের হট্টগোলের সময় জেনারেল ম্যাকআর্থার চীন, ফরমোজা ও পূর্ব-এশিয়া সম্পর্কে যে উগ্র সামরিক বিবৃতি দিয়াছিলেন, তাহার ফলে স্বয়ং প্রেসিডেণ্টকে বাধ্য হইয়া এক প্রকাশ্য বিবৃতির দ্বারা ম্যাকআর্থারের নিন্দা করিতে হইয়াছিল। ম্যাকআর্থার এই সেদিনও পূর্ব-এশিয়াতে রণপ্রভু ও রাজনৈতিক প্রভু রূপে বিরাজ করিতেছিলেন। জেনারেল ওমর ব্রাডলি আজিকার আমেরিকার একজন অন্যতম সর্বোচ্চ কর্ণধার। তিনি ১৯৫০ সালের মার্কিণ নীতি বর্ণনা করিয়া দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করিয়াছেন, "বর্তমান মার্কিণ পররাষ্ট্রীয় নীতি ও সামরিক নীতি অন্ততঃ তিনটি মূল বিষয়ে এক হইয়া গিয়াছে—(Today our foreign policy and military policy are united in three basic objectives)—যথা—(১) বর্তমান গভর্ণমেণ্ট ও মার্কিণ জীবনযাত্রার আকৃতি ও প্রকৃতি আমরা রক্ষা করিবই। এজন্য কোনপ্রকার অর্থব্যয়ে বা

চেষ্টায় আমরা ত্রুটি করিব না; (২) কোন প্রকার তোষণনীতি বরদাস্ত করা হইবে না; এবং (৩) ইউ-এন-ও'র মারফৎ শান্তি রক্ষা করিতে হইবে। কোরিয়াতে সেই যুদ্ধ এবং সেই নীতিই চলিতেছে।......আমরা স্থির করিয়াছিলাম, এশিয়াতে কমিউনিজমের বিস্তারের একটা গণ্ডি পাকাপাকিরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দিব। কোরিয়া হইতেছে সেই গণ্ডি ।"

ইহা কেবল জেনারেল ব্রাডলির ভাষ্য নহে, এই ভাষা ও ভাষ্য সমস্ত মার্কিণ জেনারেল ও মার্কিণ নেতৃবৃন্দের—যাহা কাজেও প্রতিফলিত হইতেছে। কিন্তু এই নীতির অনিবার্য পরিণাম কি? ইহার জন্যই কি প্রতিদিন যুদ্ধায়োজনের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করিতে হইতেছে না এবং শেষ পর্যন্ত কি ইহাই যুদ্ধ ডাকিয়া আনিবে না? প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কাইজারের জার্মাণী প্রুশিয়ার সমর-নেতাদের দ্বারা পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র ক্ষেত্রে পরিচালিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের নায়ক হিটলার ও মুসোলিনীও অনুরূপভাবেই রণনীতি ও রণনেতাদের পাল্লায় পড়িয়াছিলেন। এবং এশিয়া খণ্ডে আধুনিক জাপানও সামরিক নেতাদের কবলে পড়িয়াছিল। ইতিহাসের এই প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তেই দেখা যায় যে, শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত দেশ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং সম্পূর্ণ পরাজয় ও ধ্বংস মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু মার্কিণ সামরিক মুখপাত্রগণ এই সমস্ত ঐতিহাসিক নজীর ও দৃষ্টান্ত সম্পর্কে নীরব। বরং পূর্বে ম্যাকআর্থার হইতে পশ্চিমে আইসেনহাওয়ারের তর্জন-গর্জনই শুনা যাইতেছে। মার্কিণ পররাষ্ট্রীয় নীতি এই দুই রণনৈতিক সাঁড়াশীর চাপে পড়িয়াছে—অথচ তাহার লক্ষ্য কমিউনিজমের ধ্বংস!

ইউরোপীয় নীতির মর্মকথা

বর্তমান ইউরোপ ও এশিয়ায় আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি কি ভাবে প্রতি-ফলিত হইতেছে? সে কথা বলিবার আগে গোড়াতেই উল্লেখ করা দরকার যে, এই নীতি একা প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও তাঁহার গভর্ণমেণ্টের নহে, কিম্বা কেবলমাত্র ডেমোক্রাট দলেরই নহে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি প্রধান দল—ডেমোক্রাট ও রিপাব্লিকান পার্টি—উভয়েই কম-বেশী রক্ষণশীল এবং আজও এই দুই দলকে ছাড়াইয়া ধনিকগোষ্ঠী দ্বারা প্রভাবান্বিত ও পরিচালিত আমেরিকায় অন্য কোন তৃতীয় দল প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ফলে, মার্কিণ সরকারী মহল, ধনপতি ও ক্রোড়পতি মহল এবং সামরিক মহল একটি বিষয়ে একমত এবং তাহা হইতেছে

সোভিয়েট রাশিয়া ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধাচরণ করা। সেজন্যই মার্কিণ সিনেটের পররাষ্ট্র কমিটির চেয়ারম্যান দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছেন,—

"If there is anything upon which the American people are agreed it is that the greatest threat to world convalescence and peace is the political and social cancer of international communism."

অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ রূপী রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাধি পচনশীল ক্ষতের মত দুনিয়ার শান্তি ও আরোগ্যলাভের পক্ষে প্রচণ্ডতম বিঘ্নস্বরূপ এবং এ-বিষয়ে আমেরিকার জনসাধারণের কোন দ্বিমত নাই। ফলে, আমেরিকার দুইটি প্রধান দল—ডেমোক্রাট এবং রিপাব্লিকান—মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে একমত হইয়া চলিয়াছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হইতেই এই সহযোগিতার সুরু এবং তারপর ১৯৪৫-৫০ সালের প্রায় সমস্ত বৃহৎ আন্তর্জাতিক প্রশ্নেই এই "দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা" চলিতেছে—ইংরাজীতে ইহার নাম 'Bipartisan Policy' কিম্বা দুই দলের মিলিত নীতি। পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এই সম্মিলিত নীতির প্রয়োজন রহিয়াছে এই কারণে যে, মার্কিণ সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোট ছাড়া কোন সন্ধি ও চুক্তি আইন অনুসারে গৃহীত ও কার্যকরী হইতে পারে না। তারপর পররাষ্ট্রীয় নীতির বিভিন্ন দিকের জন্য যে বিপুল ব্যয়-বরাদ্দের প্রয়োজন (যেমন, বিভিন্ন দেশের সামরিক সাহায্য, অর্থনৈতিক সাহায্য ইত্যাদি), তাহাও মার্কিণ কংগ্রেসের অনুমোদন-সাপেক্ষ। সুতরাং রিপাব্লিকান বা ডেমোক্রাট উভয় পার্টির মেজরিটির (অবশ্য উপদলীয় ঝগড়া ও বিরোধ এই দুই বৃহৎ দলের মধ্যেও রহিয়াছে) ভোট ছাড়া কোন চুক্তি, সন্ধি, ব্যয়-বরাদ্দ, আর্থিক সাহায্য ইত্যাদি আইনসম্মত এবং কার্যকরী হইতে পারে না। ফলে, মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্রীয় নীতিতে দুই দলেরই সম্মতি (bipartisanship in foreign policy) ও সহযোগিতা রহিয়াছে, এ-কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার এবং এ-কারণেই এই নীতির বিরুদ্ধে বিশেষ কোন প্রতিবাদ আমেরিকা হইতে শুনা যায় না। সংবাদপত্রগুলিও ইহাদের দলভুক্ত—অবশ্য মুষ্টিমেয় শ্রমিক এবং প্রগতিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দল ছাড়া, আমেরিকায় যাহাদের বিশেষ কোন প্রভাব নাই।......

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ইউরোপের দিকে তাকাইয়া মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। সহরের পর সহর এবং দেশের পর দেশ যেন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষুধার্ত, লক্ষ লক্ষ নর-নারী বেকার,—গৃহ

নাই, আশ্রয় নাই, উপযুক্ত শীতবস্ত্র ও জীবনধারণের সম্বল নাই। হাজার হাজার পরিবার ছিন্নমূল বৃক্ষের মত উৎপাটিত—ক্ষেত-খামার, গোলাবাড়ী, কলকারখানা ইত্যাদি যেন শ্মশানে পরিণত। কেবল ইউরোপের নয়, এশিয়ারও যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলির এই অবস্থা। জাপানী ও জার্মাণ সৈন্যেরা যেখানে গিয়াছে, সেখানেই হত্যাকান্ড, লুঠতরাজ ও ধ্বংসের অভিযান চালাইয়াছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন ভাঙিগয়া গিয়াছে। এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট দেখিলেন যে, সর্বত্র 'কমিউনিষ্ট দৈত্য' মানুষের এই দুরবস্থার সুযোগ লইয়া মাথা চাড়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে, যাহার ফলে—মার্কিণ নেতৃবৃন্দের মতে—রণক্ষত ইউরোপ ও এশিয়ায় যেটুকু স্বাধীনতা, সভ্যতা ও গণতন্ত্র ছিল, তাহাও রসাতলে যাইবার মত। পূর্ব-ইউরোপের যে সমস্ত দেশে কমিউনিষ্ট সৈন্যরা ঢুকিয়াছিল, সেগুলি তো রাশিয়ার পাল্লায় পড়িয়াছিলই, অধিকন্তু পশ্চিম ইউরোপ এবং মধ্য ইউরোপেরও নাভিশ্বাস উপস্থিত হইবার মত। ইতালী, গ্রীস, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, অষ্ট্রিয়া ইত্যাদি দেশগুলিতে নিদারুণ অবস্থা। ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিষ্টরা আইন-সভায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্যপদ দখল করিয়াছিল এবং কেন্দ্রীয় লেবার ইউনিয়নগুলিও তাহাদের হাতে ছিল। ফলে, সরকারী ও বে-সরকারী সংগঠন এবং কলকারখানা ও রেলপথ ইত্যাদির উপর অসম্ভব রকমের চাপ দিয়া এবং ব্যাপক ধর্মঘট, দাঙগাহাঙগামা ও উচ্ছৃঙখলতা ঘটাইয়া তাহারা সমগ্র ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করিতে চাহিল। ১৯৪৬-৪৭ সালের ফ্রান্স এক ব্যাপক গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হইয়াছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালের গ্রীসেও কমিউনিষ্ট গেরিলা যুদ্ধ এবং গৃহবিবাদ সারা দেশকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল। অসহায় গ্রীক গভর্ণমেণ্ট ইউ-এন-ও'র সিকিউরিটি কাউন্সিল এবং মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন জানাইলেন। ইতিমধ্যে তুরস্কের দার্দানেলিস প্রণালী এবং দুইটি উত্তরবর্তী প্রদেশের উপর সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের দাবী ও চাপ উগ্র আকারে দেখা দিল। তুর্কী গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগণকে বিদ্রোহে উস্কানি দেওয়া হইল। ফলে, তুরস্ক আমেরিকার সাহায্য প্রার্থনা করিল। মধ্যপ্রাচ্যে ইরাণের অবস্থাও সংকটজনক হইয়া উঠিল। ইরাণের প্রভূত পেট্রোল-সম্পদ ও পারস্য উপসাগরের পথ নিজেদের হাতের মুঠিতে আনাই রাশিয়ার এখানে লক্ষ্য ছিল বলিয়া মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাস। উত্তরবর্তী ইরাণের আজারবাইজানে সোভিয়েট সৈন্যেরা একটা 'পুত্তলিকা গভর্ণমেণ্ট'ও স্থাপন করিয়াছিল। আর ইতালীতেও (১৯৪৮) ফ্রান্সের অনুরূপ কমিউনিষ্টদের দেশব্যাপী উপদ্রব দেখা দিল এবং সেখানেও একটা গৃহযুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠিল। মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের

দাবী এই যে, ফ্রান্স, ইতালী, গ্রীস, তুরস্ক, ইরাণ ইত্যাদি ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে সোভিয়েট রাশিয়া পূর্ব-ইউরোপের মতই একচ্ছত্র কমিউনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিত, যদি না শক্তিশালী আমেরিকা তাহাদের সদয় হস্ত প্রসারিত করিয়া যথাসময়ে যথোপযুক্ত সাহায্য না দিত।

ইহার জন্য দুই প্রকারের সাহায্যের প্রয়োজন হইল।—প্রথমতঃ, অর্থনৈতিক এবং দ্বিতীয়তঃ, সামরিক। কারণ, ১৯৪৬, ১৯৪৭ এবং ১৯৪৮ সালের ইউরোপের অবস্থা দেখিয়া মার্কিণ শাসকগণ উপলব্ধি করিলেন যে, 'অর্থনৈতিক শূন্যতা' (economic vacuum) এবং 'সামরিক শূন্যতা' (military vacuum) এই দুই গহ্বরের ফাঁক দিয়াই 'কমিউনিষ্ট দৈত্য' ঢুকিয়া থাকে, সুতরাং এই বিরাট গহ্বরগুলি পূর্ণ করা দরকার। এই সময় ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে স্বনামখ্যাত জেনারেল জর্জ মার্শাল আমেরিকার পররাষ্ট্র-মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন। এবং জুন মাসের এক বক্তৃতায় তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্য এক পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেন, যাহা 'মার্শাল প্ল্যান' নামে ইতিহাস-বিখ্যাত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঁচ বৎসরে ২০০০ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশকে আমেরিকার সাহায্য করিতে হইত। সোভিয়েট রাশিয়া সহ সকলেরই এই সাহায্য পাওয়ার কথা ছিল এবং গোড়ার দিকে পোল্যাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়া এই সাহায্য গ্রহণের জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েট রাষ্ট্রগোষ্ঠী এই পরিকল্পনার মধ্যে আমেরিকার 'সাম্রাজ্যবাদীয় চক্রান্ত' আবিষ্কার করিল এবং মার্শাল প্ল্যানের তীব্র বিরোধিতা করিল। অধিকন্তু তাহারা কোমিনফর্ম প্রতিষ্ঠার দ্বারা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদীয় সঙ্ঘের (পরিবর্তিত আকারে) পুনরুজ্জীবন ঘটাইল। এভাবে পূর্ব-ইউরোপ ও সোভিয়েট রাষ্ট্রগোষ্ঠী আমেরিকার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল এবং ইহাই ক্রমশঃ বিভিন্ন ধাপ ও স্তর অতিক্রম করিয়া ১৯৪৮ সালের বার্লিন অবরোধের মধ্যে চরম আকারে আত্মপ্রকাশ করিল।

১৯৪৫ সাল হইতে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট মার্শাল প্ল্যান হইতে সুরু করিয়া বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা ও সাহায্যের দ্বারা যে কোটি কোটি টাকা গ্রীস, তুরস্ক, ইরাণ, ইতালী, ফ্রান্স, বৃটেন, বেলজিয়াম, পশ্চিম জার্মাণী অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিকে দিয়াছেন, উহার ফলে এই সমস্ত দেশের 'অর্থনৈতিক শূন্যতা' বা গহ্বর পূর্ণ হইয়াছে এবং আসন্ন কমিউনিষ্ট প্লাবন হইতে দেশগুলি রক্ষা পাইয়া গিয়াছে। আমেরিকার দাবী এই যে, একমাত্র

মার্শাল প্ল্যান অনুসারেই ২০ কোটি লোক নূতন জীবন গঠনের সুযোগ পাইয়াছে। এই সমস্ত দেশের অধিকাংশ গভর্ণমেণ্টই ইতিমধ্যে তাল সামলাইয়া উঠিয়াছেন, পুনর্বসতি ও পুনর্গঠনের সমস্যা বহুলাংশে মিটিয়াছে, কল-কারখানাগুলি চালু হইয়াছে, জীবিকার সংস্থান হইয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই কৃষি ও শ্রম-শিল্পের উৎপাদন যুদ্ধপূর্ব বৎসরগুলির তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদি মার্কিণ পররাষ্ট্র-নীতি এই অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে মন না দিত, তবে, এই সমস্ত দেশ সোভিয়েট সাম্যবাদের প্লাবনে ভাসিয়া যাইত।

ইউরোপীয় ভূখণ্ডে জার্মাণীর অবস্থান ভৌগোলিক ও রণনৈতিক কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকার অভিযোগ এই যে, সোভিয়েট রাশিয়া পরাজিত জার্মাণীর অধিকৃত এলাকাগুলির সুযোগ লইয়া এবং পটসডাম চুক্তি ভঙ্গ করিয়া গোটা জার্মাণীকেই নিজেদের পূর্ণ তাঁবেদারীতে আনিবার বহু কৌশলপূর্ণ চেষ্টা করিয়াছিল। এমন কি, 'ঠাণ্ডা লড়াই'য়ের উৎপত্তিও এই কারণে। কিন্তু, বৃটেন ও ফ্রান্সের সহায়তায় আমেরিকা প্রতিপদে দৃঢ়তার সঙ্গে ইহাতে বাধা দিয়াছে। ফলে, পশ্চিম জার্মাণী সোভিয়েট কবল হইতে রক্ষা পাইয়া গিয়াছে—বিশেষতঃ শ্রম-শিল্প ও কলকারখানার দিক হইতে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রুর অঞ্চল লাল সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে ত্রাণ পাইয়াছে। যদি আমেরিকা বহু বিপদের ঝুঁকি লইয়া এই সমস্ত না করিত, তবে, সমগ্র জার্মাণী দখল করিয়া রাশিয়া আজ গোটা ইউরোপের মালিক হইয়া বসিত।

সামরিক দিক দিয়াও পশ্চিম ইউরোপকে আমেরিকা প্রভূত শক্তিশালী করিয়াছে। সামরিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক দিয়া শক্তিশালী না হইলে সাম্যবাদীয় আক্রমণ রোধ করা যায় না—এই নীতি হইতেই মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট পশ্চিম ইউরোপকে শক্তিশালী করিবার কর্মনীতি অনুসরণ করিতেছেন। ইহার জন্য অবশ্য পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির নিজেদেরও উদ্যোগী হইয়া পারস্পরিক সহযোগিতার ও আত্মরক্ষার পন্থা উদ্ভাবনের দরকার ছিল। এজন্য ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ৫০ বৎসরের জন্য ব্রুসেলস সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। তারপর পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে এবং উহার আত্মরক্ষার প্রয়োজন অনুসারে সামরিক সংগঠনও তৈয়ারী হইয়াছে। রাজনৈতিক পরামর্শের জন্য ইউরোপীয় কাউন্সিলের উদ্ভব হইয়াছে এবং এগুলির সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে সমসাময়িক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ উত্তর অতলান্তিক চুক্তি যাহা ১২টি রাষ্ট্রের সামরিক মৈত্রীরই নামান্তর। জেনারেল আইসেনহাওয়ার বর্তমানে উত্তর অতলান্তিক

রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ অধিনায়করূপে কাজ করিতেছেন এবং পশ্চিম জার্মাণী সহ প্রায় সমস্ত অ-কমিউনিষ্ট রাজ্যের আত্মরক্ষার সামরিক শক্তি সংহত করিতেছেন। (এই সমস্ত ঘটনা এত বহুদূরবিস্তৃত যে, এখানে নিতান্ত সংক্ষেপে কেবল উল্লেখ করা ছাড়া উপায় নাই।)

বিভিন্ন প্রকারের চুক্তি, সন্ধি ও সর্ত ইত্যাদি স্বাক্ষরের দ্বারা মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক পাকা করিয়াছেন এবং ইউরোপের বাহিরেও তাঁহারা এই নীতি অনুসরণ করিয়াছেন। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যগুলিকেও তাঁহারা রাজনৈতিক ও সামরিক মৈত্রীর মধ্যে আনয়ন করিয়াছেন। ১৯৪৫ সালের একটি বিধানের দ্বারা আন্তঃ-আমেরিকান বিরোধ আপোষে মিটাইবার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হইবার পর বিভিন্ন রাষ্ট্র ১৯৪৭ সালের গ্রীষ্মকালে আর একটি আত্মরক্ষার চুক্তিতে (যাহা 'Rio Pact' নামে অভিহিত) আবদ্ধ হইয়াছে। মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট বলিতেছেন যে, ইউ-এন-ও'র সনদ ও বিধি-বিধানের মধ্যে থাকিয়াই তাঁহারা এই সমস্ত আঞ্চলিক সর্ত (Regional pacts) ও চুক্তির দ্বারা কেবলমাত্র আত্ম-রক্ষার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছেন। কারণ, মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের অভিজ্ঞতা হইতে উপলব্ধি করিয়াছেন যে, ইউ-এন-ও'র বিভিন্ন বৈঠক ছাড়াও বহু প্রকারের কাউন্সিল, কমিটি ও কনফারেন্সে সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত যোগ দিয়া তাঁহারা কোন সম্মানজনক আপোষ-মীমাংসায় পৌঁছিতে পারেন না। কমিউনিজমের চূড়ান্ত লক্ষ্য পূর্ণ করা ছাড়া সোভিয়েট সাম্যবাদ অন্য কোন দিক হইতে শান্তিরক্ষার জন্য আমেরিকার সঙ্গে একমত হইতেছে না। সুতরাং মার্কিণ গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়াই ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের আঞ্চলিক চুক্তি, অর্থনৈতিক ও সামরিক সন্ধি ইত্যাদি করিতে হইতেছে। কারণ, আমেরিকার সমগ্র পররাষ্ট্রীয় নীতির প্রধানতম লক্ষ্য হইতেছে পশ্চিম ইউরোপের নির্বিঘ্নতা বিধান। তাঁহারা বলিতেছেন,—Security of Western Europe' —এই নীতি স্থির বিন্দুর মত। "Despite the war in Korea and the tension throughout the Far East, let us never forget it—Europe is still the pivotal point." কেবল রাজনৈতিক নেতাদেরই ইহা বক্তব্য নহে। মার্কিণ সেনানীমণ্ডলীও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত এবং তাঁহারাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, "To-day our frontiers lie in common with Europeans' in the heart of Europe"......"No enemy is likely to overcome us unless he first possesses

Western Europe, which is still the strategic point of the world."

সুতরাং ইউরোপ সম্পর্কে মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতি কেবল ইউ-এন-ও'র ভরসাতেই নাই। কিম্বা এশিয়াতে কোরিয়াই আমেরিকার একমাত্র লক্ষ্য নহে।— তাঁহাদের মতে ইউরোপ রক্ষা না পারিলে মানবসভ্যতা ধ্বংস হইয়া যাইবে। অতএব কমিউনিষ্ট অগ্রগতি ও আক্রমণ রোধ করিয়া পশ্চিম ইউরোপকে সর্বতোভাবে শক্তিশালী করিতে হইবে—ইউরোপ সম্পর্কে ইহাই মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতির মর্মবাণী। বলা বাহুল্য যে, এই সম্পর্কে নিজেদের গরজেই বৃটেন, ফ্রান্স এবং ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি আমেরিকার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। বহু সহস্র কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চিম ইউরোপে পণ্য, সৈন্য, সমরসম্ভার ও সামরিক প্রস্তুতির যে প্রভূত ঢক্কানিনাদ শুনা যাইতেছে, তাহারও মূল কারণ ইহাই।

এশিয়া-নীতির মূল লক্ষ্য

দুই মহাদেশের মধ্যে তুলনায় ইউরোপই যখন আমেরিকার নিকট প্রাধান্য অর্জন করিতেছে, তখন দূরপ্রাচ্যের নীতি লইয়া এত বিভ্রাট, এত গণ্ডগোল কেন? প্রশান্ত মহাসমুদ্রে আমেরিকার নৌ-আধিপত্য, জাপানের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মহাচীনের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া ও দ্বীপপুঞ্জের বিপুল কাঁচামালের ঐশ্বর্য—এই সমস্ত ঐতিহাসিক কারণ আমাদের নিকট যতই গুরুত্ব-পূর্ণ হউক না কেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের স্বীয় নীতির ব্যাখ্যায় ও সমর্থনে বলিতেছেন যে, পৃথিবীর সৌভ্রাত্র ও শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে অনগ্রসর এশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতি এবং গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি স্থাপনই আমেরিকার লক্ষ্য। কিন্তু সোভিয়েট সাম্যবাদ নানা কৌশলে ও চক্রান্তে এই লক্ষ্য পূরণে বাধা দিতেছে এবং এশিয়ার দেশগুলিতে রুশ সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নির্বিঘ্নতা বিপন্ন ও পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত করিতেছে। কোরিয়ায় কমিউনিষ্ট আক্রমণ ইহার নূতনতম দৃষ্টান্ত, যাহা দ্বারা বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ বা ইউ-এন-ও'কে পর্যন্ত অগ্রাহ্য করা হইতেছে। এশিয়ার দেশ-গুলিতে ২০০ কোটি লোকের বাস এবং বহু জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির দ্বারা তাহারা বিচ্ছিন্ন। আমেরিকা স্বীকার করে যে, তাহাদের এমন সাধ্য ও এমন শক্তি নাই যে, এই দুইশত কোটি লোকের সকলকেই তাহারা 'উদ্ধার' করিবে কিম্বা

শত দেড় শত বৎসর ধরিয়া তাহাদের মধ্যে যে নূতন শক্তি জাগিতেছে উহাকে তাহারা ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করিবে! কিন্তু যে সমস্ত কার্য, ঘটনা ও নীতির দ্বারা, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমূহ বিপদ ঘটিতে পারে, কিম্বা একটা মহাযুদ্ধ বাধিয়া যাইতে পারে, সেই দিকে নজর রাখা ও তেমন চেষ্টায় বাধা দেওয়া আমেরিকার পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য। অন্য কথা বাদ দিলেও নিছক আত্মরক্ষার জন্যই ইহা প্রয়োজন। কেন না, সোভিয়েট শক্তি ইউরোপের এল্‌ব্‌ নদী হইতে পূর্ব এশিয়ার ইয়াংসি তীর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, যাহার লোকসংখ্যা ও কাঁচামালের শক্তি অফুরন্ত! যুদ্ধোত্তর এশিয়া মহাদেশে কমিউনিষ্ট চীন বিপদের লাল সংকেতরূপে দেখা দিয়াছে। অথচ এই চীনের সংগে আমেরিকার যুগ-যুগান্তের "ঐতিহাসিক বন্ধুত্ব" ছিল এবং এই চীনই ছিল আমেরিকার প্রাচ্য নীতির মূল ঘাঁটি। জনৈক মার্কিণ রাজনীতিবিশারদ সগৌরবে দাবী করিতেছেন—

"In the past, the United States policy in the East rested on the foundation of—friendly relations with China. Our people, through government, missionaries, doctors and educators, have shared and built Chinese friendship for more than a century. Out of it have come such political doctrines as the Hay Doctrine of the 'Open Door' in China, the Hughes Doctrine of 'territorial integrity' for China, and the Stimson Doctrine of 'nonrecognition of the fruits of aggression'. Out of it have also come the Boxer Fund Scholarships, Christian Colleges in China, and Medical Centres, including a great Rockfeller Foundation development at Peking."
—(জন ফষ্টার ডুলেস)

চীনের প্রতি এই "কল্যাণকর মানবীয় নীতির" অনুসরণ করিতে গিয়া আমেরিকা অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছে এবং প্রভূত পরিশ্রম ও বিদ্যাবুদ্ধি খাটাইয়াছে। কুও-মিণ্টাং শাসিত জাতীয়তাবাদী চীনকে আত্মপ্রতিষ্ঠা দেওয়াই ছিল আমেরিকার উদ্দেশ্য। এজন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এ-পর্যন্ত চীনের জন্য যাহা করিয়াছে, তাহা এশিয়া মহাদেশের এক প্রকাণ্ড ইতিহাসের অধ্যায়রূপে পরিগণিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্শাল চিয়াং কাইসেক ও মহাচীনকে মিত্রশক্তির অন্যতম প্রধান অংশীদাররূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল। চীন-ব্রহ্ম-ভারত এক সামরিক পরিকল্পনায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ও প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের

বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণে চিয়াং কাইসেকের চীন ও রুজভেল্টের আমেরিকা এক হইয়া গিয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট চাহিয়াছিলেন জগৎরাষ্ট্রসভায় চীনকে মর্যাদা দিতে ও শক্তিশালী করিতে। ' এজন্য ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে কাইরোতে যখন মিত্র-প্রধানগণের বৈঠক হইল এবং চার্চিল-রুজভেল্ট-চিয়াংকাইসেক একত্র হইলেন, তখন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টই চীনকে বৃহৎ শক্তিরূপে গ্রহণের জন্য চাপ দিয়াছিলেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় চীন শেষ পর্যন্ত ইউ-এন-ও'র সিকিউরিটি কাউন্সিলে ভেটো ক্ষমতার অধিকারী রূপে অন্যতম প্রধান সদস্য-হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল।

এমন কি, মহাচীন যাহাতে আত্মঘাতী গৃহবিবাদ হইতে রক্ষা পাইয়া একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে, তেমন চেষ্টাও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র করিয়াছিলেন। মহাযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এজন্য মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট স্থির করিলেন যে, চিয়াং কাইসেকের জাতীয়তাবাদী গভর্ণমেণ্টকে বিদ্রোহী চীনা কমিউনিষ্টদের সহিত আপোষ রফা করিতে হইবে। ইহার উদ্দেশ্যে চাপ দেওয়ার জন্য মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট জেনারেল জর্জ মার্শালকে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, গৃহবিবাদে বিচ্ছিন্ন ও ক্ষত-বিক্ষত চীনকে আমেরিকার পক্ষ হইতে সাহায্যদান বাস্তববুদ্ধিসম্মত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কিন্তু আমেরিকার এই চেষ্টা শোচনীয়রূপে ব্যর্থ হইয়াছে, যদিও মার্কিণ সরকারের শুভেচ্ছার কোন অভাব ছিল না। যখন চীনের কমিউনিষ্ট ও ন্যাশনালিষ্ট-দের মধ্যে মিলন ও কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা সম্ভব নয় বলিয়া বুঝা গেল (এবং গৃহযুদ্ধ তীব্রবেগে চলিতে লাগিল), তখন ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসের নীতি (যাহা দ্বারা মিলনের চাপ দেওয়া হইয়াছিল), ১৯৪৮ সালের আগষ্ট মাসে সম্পূর্ণ বদলাইতে হইল। তখন বাধ্য হইয়া মার্কিণ সরকারকে ঘোষণা করিতে হইল যে, চীনে কমিউনিষ্টদের সহিত সহযোগিতায় কোন গভর্ণমেণ্ট গঠনে আমেরিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনপ্রকার সাহায্য বা উৎসাহ দিতে পারে না। কিন্তু ইহা ছিল নিতান্তই সাময়িক। কারণ, আমেরিকা জাতীয়তাবাদী চীনকে অন্ততঃ ৪০০ কোটি ডলারেরও অধিক সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দান করিয়াছে বহু বৎসর ধরিয়া। ইহা ছাড়া অন্যান্য ভাবে যে কত সাহায্য করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই—যেমন, ১৯৪৫ সালে জাপানী বাহিনীর আত্মসমর্পণ কাজে পরি-ণত করার উদ্দেশ্যে আমেরিকা ৪ লক্ষ চীনা জাতীয়তাবাদী সৈন্যকে সাংহাইতে ও উত্তর চীনে নিজেদের জাহাজে ও বিমানযোগে পাঠাইয়াছিল; ৫০ হাজার মার্কিণ

নৌ-সৈন্যকে অন্যান্য সাহায্য দানের জন্য পাঠানো হইয়াছিল, ইত্যাদি। অবশ্য তৎ-সত্ত্বেও চিয়াং কাইসেক নব পর্যায়ের মাত্র চারি বৎসরের গৃহযুদ্ধে কমিউনিষ্টদের হাতে পরাজিত এবং চীন হইতে বিতাড়িত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। মার্কিণ বিশেষজ্ঞগণই স্বীকার করিতেছেন যে, ইহার তিনটি কারণ— 'morale, leadership and ublic support' অর্থাৎ নৈতিক শক্তি, নেতৃত্ব এবং জনগণের সমর্থন—এই তিনের অভাব, যাহার ফলে চিয়াং কাইসেক ও কুও-মিণ্টাং গভর্ণমেণ্টের এত দ্রুত পতন হইল। কিন্তু ইহার জন্য আমেরিকা দায়ী নহে, বরং আমেরিকা এখনও চাহে যে, "জনগণের সত্যকার সমর্থনে খাঁটি গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট" প্রতিষ্ঠিত হউক। কিন্তু পিকিংয়ের কমিউনিষ্ট গভর্ণমেণ্ট রাশিয়ার সাহায্যে ক্ষমতা দখল করিয়া আমেরিকার প্রতি বিদ্বেষের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছেন এবং মার্কিণ দূতাবাসের কর্মচারীদিগকে পর্যন্ত লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়াছেন। মাও-সে-তুংয়ের নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট চীন আমেরিকার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও শত্রুতার নীতি অনুসরণ করিতেছে। মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের আরও অভিযোগ এই যে, এই শত্রুতার চরম পরিণতি ঘটিয়াছে কোরিয়াতে। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কাইরোর ঘোষণা এবং ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে পটসডাম ঘোষণা অনুযায়ী কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছিল, এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত চুক্তি অনুযায়ীই উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে ৩৮নং অক্ষরেখার সীমানা নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহা ঘটিয়াছিল নিতান্তই সামরিক প্রয়োজনে এবং কোরিয়াতে একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট গঠনের কথা ছিল ইউ-এন-ও'র তত্ত্বাবধানে।

কোরিয়ার ঘটনাবলী সর্বজনবিদিত। সুতরাং এখানে অধিকতর উল্লেখ অনাবশ্যক। কিন্তু মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের বক্তব্য এই যে, তাঁহারা কোরিয়া সংক্রান্ত প্রত্যেকটি পদক্ষেপে ইউ-এন-ও'র নির্দেশ এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি ও ঘোষণা অনুযায়ী চলিয়াছেন। কিন্তু উত্তর কোরিয়ায় কমিউনিষ্ট গভর্ণমেণ্ট যেমন আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করিয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করিয়াছেন, কমিউনিষ্ট চীনও তেমনই সমস্ত বিধিবিধান এবং ইউ-এন-ও'র কর্তৃত্ব ও মর্যাদা পদদলিত করিয়া কোরিয়ায় বে-আইনী যুদ্ধ চালাইতেছে। যদি ইহা স্বীকার করিয়া কমিউনিষ্ট চীনের নিকট নতি স্বীকার করিতে হয়, তবে আন্তর্জাতিক আইন ও শৃঙ্খলার কোন অস্তিত্ব থাকিবে না এবং ইউ-এন-ও'র কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই এ বিষয়ে আমেরিকা তথা ইউ-এন-ও'কে সমর্থন জানাইয়াছে। ইউ-এন-ও'র ৫৯টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ৫৩টি সদস্য রাষ্ট্রই উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

কেবল চীন বা কোরিয়ায় গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষার নীতিই মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য অনুসরণ করেন নাই, এশিয়ার অন্যান্য দেশ সম্পর্কেও তাঁহারা অনুরূপ দাবী করিতেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকৃতির জন্য মিঃ চার্চিলকে অনুরোধ করা হইয়াছিল এবং তারপর ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, পাকিস্থান ও সিংহলের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন লাভে মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট "আনন্দ প্রকাশ" করিয়াছেন। ওলন্দাজ শাসন হইতে ইন্দোনেশিয়ার মুক্তিলাভে ও নূতন রিপাব্লিক রাষ্ট্র গঠনে আমেরিকা ইউ-এন-ও মারফৎ প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। ১৯৪৬ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইনের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচীনকেও যথাশক্তি প্রভূত সাহায্য দেওয়া হইতেছে। এই সমস্ত দেশের পুনর্গঠন ও পুনর্বসতির জন্য আমেরিকা কয়েকশত কোটি ডলার এ-পর্যন্ত সাহায্য দিয়াছে। কারণ, এই সমস্ত দেশের আর্থিক দুর্গতি এবং অভাব-অনটন ও রাজনৈতিক বিরোধের সুযোগ লইয়া রুশ সাম্যবাদের বাহকেরা রাষ্ট্র ও সমাজবিরোধী আক্রমণ চালাইতেছে। ইহার প্রতিরোধ করা দরকার। এ-বিষয়ে মার্কিণ সমরনেতারাও অত্যন্ত সচেতন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মত মার্কিণ রণনেতারাও বলিতেছেন যে, সোভিয়েট কমিউনিজমের অগ্রগতিতে ইউরোপের চেয়েও এশিয়ার বিপদ বেশী। কেননা, ইউরোপের জাতিসমূহ যন্ত্রবিজ্ঞানে, শ্রমশিল্পে, কলকারখানায় এবং শিক্ষা ইত্যাদিতে এশিয়ার তুলনায় অনেক বেশী অগ্রগামী। ফলে, আমেরিকার কাছ হইতে বিরাট আর্থিক সাহায্য পাইয়া তাহারা শীঘ্রই তাল সামলাইয়া উঠিতে পারিবে এবং পারিয়াছেও। কিন্তু এশিয়ার দেশগুলি অনগ্রসর ও দরিদ্র। সুতরাং কমিউনিজমের আবেদন এখানে বেশী। ১৯৫০ সালে মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতি ও রণনীতি এজন্য এক নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। এই প্রসঙ্গে জেনারেল ব্রাডলি বলিতেছেন—

"In Asia we drew a line of *defense* against Communist aggression at considerable military risk. We chose to defend Korea when it was attacked, rather than watch aggressors 'pick it off' and then wait to see what country would be next."........."For months many had contended that we must *somewhere* draw the line against Communist aggression in Asia."

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কেবল রাষ্ট্রসংঘের মারফৎ আন্তর্জাতিক আদর্শ রক্ষা করাই কোরিয়া যুদ্ধের লক্ষ্য নহে, কিম্বা এশিয়াখণ্ডে মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতির

একমাত্র উদ্দেশ্যও তাহা নহে। ইহার অন্যতম মূল লক্ষ্য হইতেছে কমিউনিজমের গতিরোধ। এজন্যই প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে একমত হইয়া মার্কিণ সমর-নেতাগণ (যেমন ব্রাডলি, ম্যাকআর্থার প্রভৃতি) বলিতেছেন যে, কোরিয়া যুদ্ধে পার্শ্বদেশ রক্ষার জন্য ফরমোজা দ্বীপ ও সমুদ্রের উপর মার্কিণ নৌবহরের পাহারার যেমন প্রয়োজন, তেমনই ফিলিপাইন এবং ইন্দোচীনেরও প্রয়োজন। ইহার সঙ্গে অধিকৃত জাপান এবং ওকিনাওয়া দ্বীপসহ যে সমস্ত ঘাঁটি আমেরিকার দখলে আছে, সেগুলির দ্বারা তাঁহারা প্রশান্ত মহাসমুদ্রে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আত্মরক্ষার লাইন গড়িয়া তুলিয়াছেন। মার্কিণ নৌবহর ও বিমানবহরের পক্ষে এই সমস্ত ঘাঁটি রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। এই রণনীতি এশিয়াখণ্ডে মার্কিণ পররাষ্ট্র-নীতির সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে, যাহার ফলে ফরমোজা, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন, জাপান বা কোরিয়ায় কমিউনিষ্ট অগ্রগতি ও জয়লাভ আমেরিকা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারে না।

তথাপি মার্কিণ নেতৃবৃন্দ একটি বিষয়ে সচেতন এবং তাহা এই যে, কোরিয়ার মত "স্থানীয় যুদ্ধের" (local war) ফ্যাসাদে পড়িয়া তাঁহারা যেন পৃথিবীব্যাপী কোন মহাযুদ্ধের বিপাকে পরাজয় স্বীকারে বাধ্য না হন। এমন কি, চীনের মত প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডে যাহাতে মার্কিণ সমরশক্তি সীমাহীন প্রান্তরে ছড়াইয়া না পড়ে এবং সেই সুযোগে কমিউনিষ্ট শক্তি যাহাতে পশ্চিম ইউরোপ দখল করিয়া না বসে, সেই দিকেও মার্কিণ রণনেতারা নজর রাখিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে, কোরিয়ার যুদ্ধে তাঁহারা এত অনমনীয় মনোভাব ও জিদ প্রকাশ করিতেছেন কেন এবং চীনকে আক্রমণকারী বলিয়া চিত্রিত করিতেছেন কেন? এক কথায় উহার জবাব এই যে, কমিউনিষ্ট শক্তিকে এবং "আন্তর্জাতিক আইন-ভঙ্গকারীকে" আমেরিকা "তোষণনীতির" দ্বারা খুসী করিতে প্রস্তুত নহে। ইহার জন্য প্রয়োজনমত বিপদের ঝুঁকি লইতেই হইবে। আমেরিকা এবং আমেরিকার অনুরূপ মতাবলম্বী বিভিন্ন রাষ্ট্র এজন্য ইউরোপে এবং এশিয়ায় সামরিক আয়োজনের দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে। বলপ্রয়োগের শক্তিকে বলপ্রয়োগ দ্বারা রোধ করিতে হইবে—অনাবশ্যক তোষামোদের দ্বারা নহে। কোটি কোটি টাকা ইহার জন্য ব্যয় হইতেছে এবং কোরিয়ার যুদ্ধও এই জন্যই চলিতেছে। এশিয়াখণ্ডে মার্কিণ পররাষ্ট্রীয় নীতির মূল লক্ষ্য ইহার মধ্যে প্রতিফলিত।

মোট ফলাফল কি ?

এ-পর্যন্ত আমরা মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতির গতি, প্রকৃতি ও পটভূমিকা সম্পর্কে প্রধানতঃ মার্কিণ সরকারের দৃষ্টিকোণ হইতে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে পাঠকবর্গ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এই নীতির মোট ফলাফল কি? অর্থাৎ ইহা দ্বারা কি যুদ্ধের সম্ভাবনা নিবারিত এবং শান্তি সুনিশ্চিত হইয়াছে? কিম্বা কমিউনিষ্ট অগ্রগতি কি রুদ্ধ হইয়াছে? আমরা সংক্ষেপে উত্তর দিব,—না, কোন উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয় নাই। তবে, একথা সত্য যে, পশ্চিম ইউরোপে ও মধ্যপ্রাচ্যে কমিউনিষ্ট অগ্রগতি মার্কিণ নীতির জন্য পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু ইহার জন্য আমেরিকার যে বিরাট মূল্য দিতে হইতেছে, তাহাও ভাবিবার মত। একমাত্র জার্মাণী, অষ্ট্রিয়া ও ট্রিয়েষ্ট বন্দরে মোট ১ লক্ষ মার্কিণ সৈন্য মোতায়েন রাখিতে হইয়াছে। অতলান্তিক চুক্তি অনুযায়ী জেনারেল আইসেনহাওয়ারের নেতৃত্বে আরও বহু সৈন্য পাঠাইতে হইবে এবং ইতিমধ্যেই আরও কয়েক ডিভিসন পাঠাইবার জন্য পশ্চিম ইউরোপ হইতে তাগিদ গিয়াছে। কিন্তু ইহা দ্বারা শান্তি সুনিশ্চিত কিম্বা যুদ্ধের সম্ভাবনা নিবারিত হয় নাই। কারণ, পরস্পর-বিরোধী দুই বৃহৎ শক্তি ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আবহাওয়ায় যখন প্রতিদিন উত্তপ্ত ও উত্যক্ত হইতেছে, তখন মার্কিণ ও সোভিয়েট সৈন্যদলের মধ্যে যে-কোন ছুতায় একটা সংঘর্ষ বাধিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। আমেরিকা ও রাশিয়া আজ ইউরোপীয় মহাদেশে পরস্পরের বিপজ্জনক সীমানার মুখোমুখী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ আমেরিকা এতদিন ছিল বহু দূরে—১৯৪৬—৪৮ সালের ঘটনাবলীর দ্বারা তাহারা আজ পরস্পরের মুখোমুখী। ইহার জন্য 'ট্রুম্যানীয় মতবাদ' দায়ী। একটি মার্কিণ-রাষ্ট্র-বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্রে (The Annals of the American Academy, May, 1948) বলা হইয়াছে—

"The Truman Doctrine has led the United States to Greece and Turkey and thus to the threshold of Russia's richest province, the Ukraine, and principal storehouse of oil, the Caucasus. In Iran, the diplomatic initiative of the United States advanced the limits of American influence to the shores of the Caspian."

অর্থাৎ, ট্রুম্যানীয় নীতির ফলে আমেরিকা, গ্রীস ও তুরস্কের মারফৎ উক্রাইন ও ককেশাসের দ্বারে এবং ইরাণের মারফৎ কাস্পিয়ান সমুদ্রের তীরে পৌঁছিয়াছে—

স্থানগুলি পেট্রোল এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে রাশিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যশালী। সুতরাং বিপদের সম্ভাবনা কিছুমাত্র কমে নাই। অথচ ইউরোপ বা পশ্চিম ইউরোপকে বর্তমান পৃথিবীর শক্তি-কেন্দ্রের চাবিকাঠিরূপে ধরিয়া লইয়া মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট বর্তমানে কেবল সামরিক বিপদই নিজেদের ঘাড়ে লন নাই, অর্থনৈতিক বিপদের ঝুঁকিও লইয়াছেন অসামান্য। দুইটি মহাযুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ঐশ্বর্য যেমন গগনচুম্বী হইয়াছে, তেমনই ১৯১৭ সালে আমেরিকার জাতীয় ঋণ যেখানে ছিল ৩০০ কোটি ডলার, ১৯৪৯ সালের শেষভাগে উহা দাঁড়াইয়াছে ২৫৭০০ কোটি ডলার। এখানে মার্কিণ অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনার কোন অবসর নাই। তবে, ইতস্ততঃ কয়েকটি ব্যয়ের পরিমাণ উদ্ধৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—"স্বদেশে এবং বিদেশে আমেরিকার এই বিপুল ব্যয় ও ঋণের পরিণাম কি?" গ্রীস, তুরস্ক এবং মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী ইউরোপীয় পুনর্গঠন ও সামরিক সাহায্যদান বাবদ বার্ষিক অন্ততঃ ৬০০ কোটি ডলার ব্যয় হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ২০০০ কোটি ডলার নানাভাবে বিদেশে সাহায্য দিতে হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, এই দুই হাজার কোটি ডলার মার্শাল প্ল্যানের মধ্যে ধরা হয় নাই। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এই সাহায্য ও ঋণদানের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩০০০ কোটি ডলার। আর ১৯৫০ সাল পর্যন্ত গত ১০ বৎসরে "বে-সরকারী প্রাইভেট সাহায্যের" মোট পরিমাণ গিয়াছে ১১০ কোটি ডলার। একমাত্র গ্রীস ও তুরস্কের জন্যই প্রথম তিন বৎসরে ব্যয় হইয়াছে ১৮০ কোটি ডলার। মার্কিণ সরকারের মুখপাত্ররাই স্বীকার করিতেছেন,—

"The President's programme involved the drafting of new man power, the calling up of reserves. It involved doubling the defence budget so that by June, 1951, we would be spending at the rate of 30 billion dollars a year. It meant raising at least 5 billion dollars more in taxes."
অর্থাৎ, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নীতির ফলে দেশরক্ষা খাতে গড়পড়তা ব্যয় দাঁড়াইতেছে বার্ষিক তিন হাজার কোটি ডলার এবং ইহার জন্য অন্ততঃ ৫০০ কোটি ডলার পরিমাণ অতিরিক্ত ট্যাক্স আদায় করিতে হইবে। কিন্তু আমেরিকার নূতনতম বাজেটে ১৯৫১—৫২ সালের জন্য যে ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, স্বদেশে ও বিদেশে সামরিক প্রস্তুতির জন্য আরও কয়েক সহস্র কোটি ডলার ব্যয় করিতে হইবে। মোট রাজস্বের প্রায় শতকরা ৬৯ ভাগই সামরিক প্রয়োজনে

খরচ করা হইবে এবং সেই অনুপাতে আবার ট্যাক্স বাড়িবে। ইহা দ্বারা আমেরিকার আভ্যন্তরীণ জীবনে কোন সুখ-সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়াছে কি, কিম্বা জীবনযাত্রার মান বাড়িতেছে কি?—যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, তাঁহারা বলিতেছেন, না। বরং ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর নিউইয়র্কের খবরে দেখা যায় যে, আমেরিকায় আর মাহিয়ানা বৃদ্ধি করিয়াও কোন লাভ নাই। কারণ, অতিরিক্ত ট্যাক্স, আর জীবনযাত্রার বর্ধিত ব্যয় মিলিয়া বাড়তি মাহিয়ানাকে কার্যতঃ বাতিল করিয়া দিতেছে। ১৯৪০ সালের তুলনায় অন্ততঃ চতুর্গুণ ব্যয়-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ইহা দ্বারা চাকুরীজীবী ও শ্রমজীবী সম্প্রদায় কোন্ দিকে যাইতেছে তাহা অনুমেয়। কারণ, বেকার ও অর্ধবেকারের সংখ্যা প্রতি মাসে বাড়িতেছে এবং ১৯৫০ সালে উহা বহু লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। অথচ কোটি কোটি টাকার অঙ্ক, সোজা কথায় টাকার পাহাড় রচনা করিয়াও কিন্তু পৃথিবীতে শান্তি আনা যাইতেছে না, ইউরোপকে ঠাণ্ডা কিম্বা এশিয়াকে শান্ত করা যাইতেছে না। বরং এশিয়াখণ্ডেই আমেরিকা আজ সবচেয়ে বেশী বিপদে পড়িয়াছেন কোরিয়া ও চীন উপলক্ষে, যদিও এখানেও তাঁহারা কয়েক সহস্র কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। সেই ব্যয়ের পরও তাঁহারা দেখিতেছেন যে, সমগ্র চীন কমিউনিষ্টদের করায়ত্ত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াও সাম্যবাদীয় উগ্রতায় আলোড়িত। শুধু আলোড়িত নহে, এশিয়া মহাদেশে মার্কিণনীতির জন্য নিদারুণ প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছে এবং সর্বত্র যুদ্ধের জন্য একটা আতঙ্কিত উদ্বেগ দেখা দিয়াছে। সুতরাং এই পররাষ্ট্রীয় নীতি সার্থক হইতেছে, এমন কথা জনসাধারণ কিভাবে উপলব্ধি করিবে?

অথচ মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে দাবী করিতেছেন যে, স্বাধীন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট জর্জ ওয়াশিংটন যে পররাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা আজও অব্যাহত আছে এবং সেই নীতি হইতেছে—

"Observe good faith and justice toward all nations. Cultivate peace and harmony with all." পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এই মহৎ নীতি আজও মার্কিণ সরকারের প্রথম লক্ষ্য বলিয়া দাবী করা হইতেছে। এই লক্ষ্য ছিল বলিয়াই আধুনিক কালের মার্কিণ ইতিহাসে স্বনামধন্য প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ১৯৩৭ সালে নাৎসী আক্রমণে দুনিয়া-ব্যাপী "অরাজকতার সংক্রামক ব্যাধি" লক্ষ্য করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত জাতিগুলিকে (জার্মাণী, ইতালী ইত্যাদি) "আলাদা" করিয়া রাখার নীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং দ্বিধাহীন ভাষায় বলিয়াছিলেন, "আমেরিকা যুদ্ধকে ঘৃণা করে, আমেরিকা শান্তির আশা করে, সুতরাং শান্তির সন্ধানেই সে ব্যস্ত।" এই যুদ্ধ-বিরোধী

মনোভাব ও স্থায়ী শান্তির সন্ধানেই রুজভেল্ট মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়ার সহিত সহযোগিতার জন্য এত ব্যগ্র ছিলেন। তাঁহার আশা ছিল যে, মিত্রশক্তি বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংগে মিত্রতার দ্বারা রাশিয়ায় যে সহযোগিতা গড়িয়া উঠিবে, উহার ফলে ভাবী পৃথিবী নিরাপদ হইবে। ইহার জন্য যদি রাশিয়াকে "কিছু মূল্য" দিতে হয়, তাহাও "অত্যধিক" বিবেচিত হওয়া উচিত নহে এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার যে তাগিদ ও প্রয়োজন রাশিয়া ও অন্যান্য দেশ অনুভব করিবে, উহার ফলে "মধ্যপন্থা অনুসারী" সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তি গড়িয়া উঠিবে, যাহা দ্বারা "কমিউনিজমের ধ্বংসকর উপাদানগুলি" ক্রমে ক্রমে নষ্ট ও বিলীন হইয়া যাইবে। মিঃ সামনার ওয়েলস তাঁহার একখানি পুস্তকে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মনোভাবের এই সরল ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, যাহা ট্রুম্যানের আমলে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। এমন কি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নীতি ও মনোভাবকে বর্তমান মার্কিণী শাসক মহলের ও ধনিক মহলের এক শক্তিশালী অংশ "শান্তির পক্ষে বিঘ্নজনক" বলিয়া মনে করিতেছেন। অর্থাৎ তেহরাণ, ইয়াল্টা ও পটসডামে যে সমস্ত নীতি ও কর্মপদ্ধতি স্থির হইয়াছিল, সেগুলিকে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি "তোষণনীতি" বলিয়া ভ্রান্ত ব্যাখ্যা ও প্রচারকার্য চলিতেছে। সেই প্রচারকার্য ও অর্ধ-সত্যের অপভাষণ এমন চরমে উঠিয়াছে যে, গোটা সোভিয়েট সমাজকে নাস্তিক ও নীতিহীন বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও নীতি-ধর্মের বড়াই করিতেছেন, তাঁহারা ১৯১৪ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত পৃথিবী-ব্যাপী কত কোটি লোককে একমাত্র যুদ্ধের দ্বারা হত্যা করিয়াছেন, সেই হিসাব কি ইতিহাসে নাই? ধর্মের নামে, সম্প্রদায়ের নামে এবং জাতির নামে এই ঈশ্বর-ভক্তের দল যুগ যুগ ধরিয়া দেশ-দেশান্তরে লক্ষ লক্ষ মানুষের পরিবারকে উচ্ছন্নে দিয়াছেন, অজস্র রক্তপ্রবাহে, দারিদ্র্যে ও ব্যভিচারে এবং দুর্ভিক্ষে ও মহা-মারীতে কোটি কোটি মানুষকে তলাইয়া দিয়াছেন। তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, সভ্যতার সৃষ্টি হইতে আজ পর্যন্ত সমস্ত যুদ্ধ, হত্যাকান্ড ও অত্যাচারের হিসাব ধরিলে তথাকথিত নাস্তিকেরা ইহার সহস্র ভাগের এক ভাগের জন্যও দায়ী নহে! আজও কোরিয়াতে ঈশ্বরবাদী ও নীতিবাদীর দল কামান, বোমা ও সংগীনের মুখে সমস্ত দেশটাকে ছারেখারে দিতেছেন। অথচ যে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিণ পররাষ্ট্রীয় নীতি এত মারমুখো, সেই গণতন্ত্র এখনও অজস্র চিতাভস্মের মধ্যে পূর্ব-এশিয়ায় চাপা পড়িয়া আছে। আর পশ্চিম ইউরোপে সেই পুরানো জাতীয়তাবাদ ও অর্থনৈতিক প্রভুত্বের দাবী আমেরিকার কল্যাণে আবার

জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেও এরূপ ঘটিয়াছিল এবং এজন্য ওয়েণ্ডেল উইল্‌কি আমেরিকার চিন্তাশীল সমাজকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন এবং "One World" বা এক বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের দিকে যাহাতে সমবেত চেষ্টা হইতে পারে, সেইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদ, সামরিকবাদ ও অর্থনৈতিক একাধিপত্যের হুজুগ আবার দেখা দিতেছে এবং ফ্যাসিষ্ট জার্মাণী, ইতালী ও জাপান যেভাবে রাশিয়া ও কমিউনিজমের বিভীষিকা প্রচার করিয়া ইউরোপকে যুদ্ধের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছিল, আধুনিক দুনিয়াও সেইদিকে চলিতেছে। ইহার জন্য পশ্চিম ইউরোপের মনেও সোয়াস্তি নাই। এমন কি, গত ডিসেম্বর মাসে বৃটেনের সরকারী মহল উগ্র মার্কিণনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উত্তর কোরিয়াতে ম্যাকআর্থারের সামরিক বিপর্যয় এবং প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান কর্তৃক এটম্ বোমা বর্ষণের হুমকি প্রায় সারা জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। স্বয়ং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এট্‌লিকে এজন্য ওয়াশিংটনে ছুটিতে হইয়াছিল তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য। কারণ, বৃটেন ও পশ্চিম ইউরোপ যেমন অবিলম্বেই যুদ্ধে যোগ দিতে প্রস্তুত নহে, তেমনই এটম্ বোমার বর্বরতাও তাহারা হজম করিতে অক্ষম—একমাত্র গোঁড়া চার্চিলপন্থী কয়েকজন ছাড়া। এই আণবিকশক্তি লইয়াও আজ পর্যন্ত ইউ-এন-ও'তে আমেরিকা ও রাশিয়ার কোন মতের মিল হয় নাই। কারণ, মার্কিণ সমরবাদিগণ এই এটম্ বোমাকে ব্রহ্মাস্ত্ররূপে একমাত্র নিজেদের হাতে রাখিতে চাহেন।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ছিলেন ইউনাইটেড নেশন্স বা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রধান নেতা ও পৃষ্ঠপোষক, যাঁহারা একত্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট শক্তিপুঞ্জকে পরাজিত করিবার জন্য অবর্ণনীয় দুঃখবরণ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। এই সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সহযোগিতা হইতে 'United Nations Organisation' বা ইউ-এন-ও'র উদ্ভব হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর গঠিত লীগ অব নেশন্স বা বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের মত যাহাতে এই নবগঠিত রাষ্ট্রসঙ্ঘ ব্যর্থ না হয়, সেজন্য বিবিধ বিধান, সনদ ও সংগঠনের দ্বারা ইহাকে সম্পূর্ণ নূতনভাবে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রাক্তন বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের কখনও সদস্য ছিলেন না, সোভিয়েট ইউনিয়নও মাত্র অল্প সময়ের জন্য যোগ দিয়াছিলেন। ১৯৩৯ সাল শেষ হইবার আগেই পৃথিবীর কয়েকটি বৃহত্তম রাষ্ট্র—যেমন, আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মাণী, জাপান ও ইতালী—ইহার বাহিরে ছিলেন। এবার আমেরিকা ও সোভিয়েট

রাশিয়া সহ আজ পর্যন্ত মোট ৬১টি রাষ্ট্র, অর্থাৎ ভূতপূর্ব শত্রুরাষ্ট্রগুলি ছাড়া পৃথিবীর অধিকাংশ স্বাধীন রাষ্ট্রই ইউ-এন-ও'র সদস্যপদে আসীন। কিন্তু সেই ইউ-এন-ও'র দশা আজ কি হইয়াছে? রুশ-মার্কিণ ব্লকে বিভক্ত হইয়া ইহা ভাঙ্গিয়া যাইবার মত হইয়াছে। এশিয়ার অধিকাংশ রাষ্ট্র কোরিয়া উপলক্ষে আমেরিকার বিরুদ্ধে গিয়াছে, যদিও তাহারা কমিউনিজম চাহে না। চীন ও ফরমোজা সম্পর্কেও বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতের মিল নাই। অতএব প্রশ্ন উঠিবে যাহারা কমিউনিজম চাহে না, সেই সমস্ত দেশও আমেরিকার প্রতি বিরূপ কেন, এবং কমিউনিষ্ট চীন, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, মিশর ইত্যাদি অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলিকে বাদ দিয়া আমেরিকার বহুগর্বিত শান্তিনীতি এশিয়ায় কি সফল হইতে পারে কিম্বা ইউ-এন-ও কার্যকরী হইতে পারে? এশিয়া মহাদেশের অন্ততঃ শত বৎসরের দুঃখের ইতিহাস কেন আমেরিকা উপেক্ষা করিতেছে? তাঁহাদের দেশে জ্ঞানী, গুণী ও হৃদয়বান লোকের অভাব নাই। কিন্তু তাঁহাদের পররাষ্ট্রীয় নীতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহা একান্তরূপে সামরিক মহল ও বণিক মহলের পাল্লায় পড়িয়াছে, যাঁহারা দুনিয়াকে কেবলমাত্র "কামান ও পণ্যদ্রব্য" ('guns and goods') দিয়া বিচার করিতেছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মারাত্মক ত্রুটি এখানে।

এই সমালোচনা কেবল আমাদের নিজেদের নহে। আমরা এ-পর্যন্ত ইচ্ছা করিয়াই মার্কিণ সরকার ও তাঁহাদের মুখপাত্রগণের মন্তব্য যথাসম্ভব পক্ষপাতহীনভাবে প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছি—জনসাধারণকে মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের মনোভাব বুঝাইবার জন্য। সেই প্রসঙ্গে আমরা জন ফষ্টার ডুলেসের বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছি। কারণ, ইউরোপে চার্চিল যেমন রক্ষণশীল বৃটিশ জাতির মুখপাত্র, আমেরিকায় জন ফষ্টার ডুলেসেরও সেই ভূমিকা ও প্রতিষ্ঠা। তিনি মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতির স্বপক্ষে এক প্রচারমূলক গ্রন্থ লিখিয়াও শেষ পর্যন্ত তাল সামলাইতে পারেন নাই। নিজের স্ব-বিরোধিতায়, অপব্যাখ্যায় ও ভ্রান্ত যুক্তিজালের মধ্যে নিজের অজ্ঞাতসারেই ধরা পড়িয়াছেন। কারণ, শেষ পর্যন্ত তাঁহার বক্তব্যের মূল মর্ম এই—"রণনীতি ও অর্থনীতির বিবেচনায় যে সমস্ত এলাকা দুর্গের মত নিরাপদ করিয়া তোলা যাইবে বলিয়া স্থির হয়, আমাদের অর্থনীতি ও বাজেট বিশেষজ্ঞগণ সেখানেই কোটি কোটি ডলার নিয়োগ করিয়া থাকেন। ইহার উদ্দেশ্য নিতান্তই বৈষয়িক বা ব্যবসা-বাণিজ্যের রক্ষা। এভাবে আমরা আমাদের বৈষয়িক সামর্থ্যের শেষ সীমায় গিয়া পৌঁছিতেছি। দক্ষিণ আমেরিকার চুক্তি, উত্তর

অতলান্তিক চুক্তি এবং 'ট্রুম্যান ডকট্রিন' ইত্যাদির ফলে আমরা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরের তীর—এই বিরাট এলাকায় গিয়া পৌঁছিয়াছি। কারণ, ইহাই 'আমাদের আশু সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের গণ্ডি!"

সোজা কথায় মার্কিণ ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য রণ-নীতি বা সামরিক শক্তি প্রয়োগ এবং বিরোধীদিগকে বাধাদানই আজ মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতিতে বড় হইয়া দেখা দিতেছে। সুতরাং ইউ-এন-ও ব্যর্থ হইতেছে, দুনিয়ার শান্তি রক্ষা পাইতেছে না এবং যুদ্ধের ভীতিও নিবারিত হইতেছে না। আবার ইহারই পাল্টা আবর্তে আমেরিকার লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় হইয়া যাইতেছে।

এই সমস্ত নীতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, শাসক আমেরিকার ঐশ্বর্য আছে, কিন্তু কোন বলিষ্ঠ নৈতিক আদর্শ নাই। স্বয়ং ডুলেস সাহেবই শেষ পর্যন্ত আর্তনাদ করিয়া বলিতেছেন—"লোকে আমেরিকার ঐশ্বর্য দেখিয়া কত না মুগ্ধ হইতেছে। মার্কিণ 'mass production'-এর এই বিপুল বিস্ময়—বাড়ী, গাড়ী, রেডিও, টেলিফোনের যেন রাজসূয় যজ্ঞ! কিন্তু এই অপরিমিত বৈষয়িক উন্নতি সত্ত্বেও আমরা আত্মিক দিক হইতে দেউলিয়া— 'We are spiritually bankrupt!' অথচ এদিকে দিন দিন কমিউনিজমের জয়যাত্রা ঘটিতেছে এবং 'কমিউনিষ্ট নিগড়ে বন্দী যাহারা', তাহাদিগকে আশা ও ভরসার কোন বাণী বা message দিবার মত আমেরিকার কিছু নাই।"

"'We are in a dilemma, and it is a grave dilemma. Because we have not resolved it, our spiritual influence in the world has waned, and we are tied down to the area that we can reach and influence by material things—guns and goods!"

মার্কিণ পররাষ্ট্রীয় নীতির ব্যর্থতা সম্পর্কে ইহার চেয়ে মর্মান্তিক স্বীকারোক্তি আর কি হইতে পারে?—"আমেরিকা সংকটে এবং গভীর সংকটে পড়িয়াছে। এই সংকটের মীমাংসা হইতেছে না এবং পৃথিবী হইতে আমেরিকার নৈতিক শক্তিও কমিয়া যাইতেছে। ফলে, আমেরিকা কেবলমাত্র সেই সমস্ত এলাকায় আবদ্ধ রহিয়াছে, যে সমস্ত এলাকায় সে কেবল 'মাল ও কামান' দিয়া পৌঁছিতে পারিতেছে!"

এই ব্যর্থতার জন্য বর্তমান শাসক-মহল কি দায়ী নহেন?

সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি

ধনিক জগতের অভিশাপ

বর্তমান ধনিক জগতের অধিপতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার যে পৃথিবীব্যাপী সংঘাত চলিতেছে, উহা কোন অনৈতিহাসিক কিম্বা অস্বাভাবিক ঘটনা নহে। সোভিয়েট সাম্যবাদের যে ভীতি ও বিদ্বেষ হইতে আমেরিকা রাশিয়াকে শত্রুর মত সন্দেহাকুল দৃষ্টি দিয়া বিচার করিতেছে, সেই ভীতি ও অবিশ্বাস আমেরিকা তথা ধনিক জগতের প্রতিও রাশিয়ার রহিয়াছে। কোনও দেশের পররাষ্ট্রীয় নীতিকেই যেমন উহার আভ্যন্তরীণ সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সংগঠন হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তেমনই জাতীয় জীবনের ইতিহাস হইতেও উহাকে পৃথক করিয়া দেখা সম্ভব নহে। জারের সুবৃহৎ সাম্রাজ্যও গড়িয়া উঠিয়াছিল বহু যুদ্ধ ও রক্তপাতের মধ্য দিয়া, আবার সোভিয়েট রাষ্ট্রেরও জন্মলাভ হইয়াছিল রণক্ষেত্রের শোণিতপাতের মধ্যে—যাহার পিছনে ছিল অতীতের বীভৎস অত্যাচার ও পীড়নের কাহিনী। কিন্তু এই পীড়ন হইতে সর্বব্যাপক গণমুক্তির সন্ধান করিতে গিয়া প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইবার মাত্র এক বৎসর আগে যখন ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে সোভিয়েট বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইল, তখন যুধ্যমান ধনতান্ত্রিক জগতের ক্রুদ্ধ অভিশাপ বর্ষিত হইল নবজাতকের উপর। সেই অভিশাপ আজও (১৯৫১ সালে) অব্যাহত আছে এবং আছে সেই সঙ্গে বিদ্বেষ, অবিশ্বাস ও ভীতি। বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্য-শক্তির মিত্ররূপে জারের রুশ সাম্রাজ্য কাইজারের জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতেছিল বটে, কিন্তু পরাজিত সৈন্যদল ও অত্যাচারিত জনগণের ছিল না এই যুদ্ধে রুচি ও উৎসাহ। 'শান্তি, রুটি ও জমি' বা 'Peace, Bread and Land'—এই দাবীতে বলসেভিক পার্টি জনগণের চিত্ত হরণ করিলেন এবং যখন সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও গভর্ণমেণ্ট গঠন করিলেন এবং রাশিয়ার পক্ষ হইতে অবিলম্বে যুদ্ধে ক্ষান্তি দেওয়ার জন্য দাবী জানাইলেন, তখন মৃত জারের রাশিয়ার অনুগামী বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে নিদারুণ প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিহিংসা দেখা দিল। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট কেবল রাশিয়ার জনগণের পক্ষ হইতেই যুদ্ধের অবসান ও শান্তির আবেদন জানাইলেন না, যুদ্ধরত সমস্ত দেশের শ্রমিক ও জনগণের উদ্দেশে অনুরূপ আবেদন প্রচার করিলেন এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর ব্রেষ্টলিটোভস্ক সহরে জার্মাণীর সহিত এক যুদ্ধ-বিরতির (armistice) চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। রাশিয়া মিত্রশক্তির পক্ষ ত্যাগ করিল,

কিন্তু জার্মাণীর সমরবাদিগণ সোভিয়েট প্রতিনিধিগণের সহিত শান্তি-সন্ধি আলোচনার সময় এমন কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন, যাহার ফলে সেই আলোচনা ফাঁসিয়া গেল। কারণ, হিণ্ডেনবুর্গ, লুডেনডর্ফ প্রভৃতি জার্মাণ রণনেতাগণ চাহিলেন রাশিয়ার দুরবস্থার সুযোগ লইয়া উক্রাইনের উর্বর ক্ষেত্রগুলি গ্রাস করিতে (হিটলারেরও অনুরূপ লক্ষ্য ছিল)। সুতরাং ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জার্মাণী পুনরায় বাল্টিক রাজ্য ও উক্রাইন আক্রমণ করিল এবং বাকুর তৈলখনি অঞ্চলে পর্যন্ত সৈন্য নামাইল। এভাবে জার্মাণী রাশিয়ার এক বিরাট অংশ দখল করিবার পরে সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে পুনরায় শান্তি-সন্ধির কথা উঠিল এবং মার্চ মাসে (১৯১৮) ব্রেষ্টলিটোভস্কের শোচনীয় শান্তি-সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল, যাহার জন্য রাশিয়াকে প্রভূত মূল্য দিতে হইল। অবশ্য ৮ মাস পরে জার্মাণীতেও বিপ্লব দেখা দিল এবং এই সন্ধি বাতিল হইয়া গেল ও জার্মাণ সৈন্যরা রাশিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু মিত্রশক্তিবর্গ সোভিয়েট সরকারকে স্বীকার করিলেন না বরং উহার পতন ঘটাইবার জন্য চক্রান্ত করিলেন। বলসেভিক পার্টি ক্ষমতা হস্তগত করিবার পর সমস্ত জমিদার, পুঁজিপতি ও ধনিক সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ এবং তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন ও জমি কৃষকদের মধ্যে বিলি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রাক্তন জার গভর্ণমেণ্টের সমস্ত বৈদেশিক ঋণও অস্বীকার করিলেন এবং বৈদেশিক মূলধনও বাজেয়াপ্ত করিলেন। ফলে, ঘরে এবং বাহিরে বিপদ দেখা দিল। জার আমলের বড় বড় সেনাপতি, অভিজাত ও ধনিকবৃন্দ নূতন গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেন এবং বৃটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য মিত্রশক্তি তাঁহাদিগকে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইলেন। ১৯১৮ সালের আগষ্ট মাসে বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যেরা উত্তর রাশিয়াতে অভিযান করিল সেখানকার নবগঠিত "উত্তর রুশ গভর্ণমেণ্টকে" রক্ষা করিবার জন্য। দক্ষিণ রাশিয়া এবং পূর্ব সাইবেরিয়াতেও অনুরূপ কাণ্ড ঘটিল—সেখানে জাপানী সৈন্যরা হানা দিল। অর্থাৎ ১৯১৮-১৯ হইতে ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাশিয়ার সর্বত্র চলিল ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ এবং সেই সঙ্গে মিত্রশক্তিবর্গের সশস্ত্র অভিযান। প্রায় একক হস্তে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সমগ্র ধনিক জগতের এবং শ্রেণী-আভিজাত্যের বাহকগণের বিরুদ্ধে দৃঢ়হস্তে যুদ্ধ চালাইলেন—সেই দুঃসময়ের ইতিহাস শিক্ষিত পাঠকবর্গের নিকট সুপরিচিত।

কিন্তু ঘরে-বাইরে শত্রুদের বিরুদ্ধে এভাবে যুদ্ধ চালাইতে বাধ্য হইলেও লেনিনের নেতৃত্বে নূতন সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট বারবার শান্তি প্রার্থনা করিতে

লাগিলেন, বিপ্লবী গভর্ণমেণ্ট গঠনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই, ১৯১৭ সালের ৮ই নভেম্বর তারিখে বলসেভিক সরকার "ন্যায়সংগত গণতান্ত্রিক শান্তির" জন্য এক ঘোষণা-বাণী প্রচার করিলেন,—যে শান্তির অর্থ হইতেছে পরের দেশ ও জমি দখল না করা, অপর কোন জাতিকে পরাধীন না করা এবং ক্ষতিপূরণের দাবী না করা— 'by such a peace the government means an immediate peace without annexations (*i. e.*, the seizure of foreign lands or the forcible incorporation of foreign nations) and indemnities'.

যে গভর্ণমেণ্ট নিজেদের দেশে "পরের জমি ও সম্পত্তি" বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন, তাঁহারা বৈদেশিক নীতিতে (সেই প্রথম পররাষ্ট্রীয় নীতির সূত্রপাত) সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলিতেছেন, এমন অসামঞ্জস্য বৈদেশিক শক্তিবর্গ বিশ্বাস করিবে কিরূপে? সুতরাং এই ঘোষণা পশ্চিমী শক্তিবর্গের মনে অধিকতর অবিশ্বাস এবং সন্দেহের উদ্রেক করিল। এদিকে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট রাশিয়ার সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার এবং সমস্ত জাতির পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া লইলেন, জার-অধিকৃত ফিনল্যাণ্ডের পূর্ণ স্বাধীনতা ও আর্মেনিয়ার আত্মস্বাতন্ত্র্যের দাবী স্বীকার করা হইল। পারস্য বা ইরাণ হইতে সমস্ত রুশ সৈন্য প্রত্যাহার করা হইল, জারের আমলের পাওনা টাকা ও অসম সন্ধিগুলি বাতিল করিয়া দেওয়া হইল এবং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন রাজ্যের সংগে নূতন শান্তি-সন্ধি স্বাক্ষরের পালা সুরু হইল। কিন্তু পশ্চিমের মিত্রশক্তিবর্গ এই সমস্ত নীতির মহিমা স্বীকার করিলেন না। তাঁহারা নূতন সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করিবার জন্য কোন চেষ্টার ত্রুটি রাখিলেন না। বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মাণী, আমেরিকা ও জাপানসহ ১৪টি রাষ্ট্র সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করিবার চক্রান্তে কোনও-না-কোন ভাবে জড়িত ছিল। ১৯১৯ সালের গ্রীষ্মকাল হইতে ক্রমাগত আড়াই বৎসর ধরিয়া বৈদেশিক হস্তক্ষেপ বা 'war of intervention' এবং গৃহযুদ্ধ চলিয়াছিল, যাহার ফলে দুর্ভিক্ষে, অনাহারে ও ব্যাধিতে এবং যুদ্ধজনিত কারণে রাশিয়ার ৭০ লক্ষ নরনারী ও শিশু মারা পড়িয়াছিল এবং সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের মতে বৈষয়িক ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল ৬ হাজার কোটি ডলার মূল্যের বা জার গভর্ণমেণ্টের সমগ্র বৈদেশিক ঋণের চেয়েও অনেক বেশী। আর রাশিয়ার গৃহযুদ্ধের জারপক্ষীয় সেনাপতিদিগকে সাহায্য দিতে গিয়া বৃটেন ও ফ্রান্স অন্ততঃ ১৫ কোটি পাউণ্ড খরচ করিয়াছিল। কিন্তু জার-সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিবার জন্য বৃটেন ও ফ্রান্সের এত গরজ কেন? কারণ, এই

সাম্রাজ্য আসলে ছিল ইংগ-ফরাসী ধনপতিগণের একটি উপনিবেশ মাত্র ঃ—

The Czarist Empire, for all its outward show of wealth and power, had actually been a semi-colony of Anglo-French and German financial interests. The French financial stake in Czarism amounted to the sum of 17,591,000,000 francs. Anglo-French interests controlled no less than 72 per cent of Russian coal, iron and steel, and 50 per cent of Russian oil. Annually, several hundreds of millions of francs and pounds in dividends, profits and interest were drawn from the labour of the Russian workers and peasants by foreign interests allied with the Czar". ("The Great Conspiracy Against Russia" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য, যে পুস্তকে ১৯১৯-১৯৩৯ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ধনিক জগতের ব্যাপক চক্রান্তের দলীলপত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে)। এই বর্ণনা হইতেই বুঝা যাইবে জারের রাশিয়ার আসল চেহারা কি ছিল এবং সেই সময় রাশিয়াতে ইংগ-ফরাসীর নিয়োজিত মূলধনের মোট পরিমাণ ছিল প্রায় ৮০০ কোটি ডলার। সোভিয়েট বিপ্লবের ফলে এই সমস্তেরই উচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। সুতরাং পশ্চিম ইউরোপীয় ধনিক সম্প্রদায়ের পক্ষে ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ ছিল বৈকি! তথাপি রাশিয়া ঘর গুছাইবার জন্য শান্তির আশা ছাড়িল না। বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও গৃহযুদ্ধের সময় রাশিয়া অন্ততঃ ৯ বার শান্তির প্রস্তাব করিযা পাঠাইল এবং এই প্রস্তাবের একমাত্র সর্ত ছিল, রাশিয়া হইতে সমস্ত বিদেশী সৈন্যের অপসারণ। কিন্তু প্রত্যেকবারেই রাশিয়ার শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইল এবং এই প্রত্যাখ্যান করিতেছিলেন কাঁহারা?—যাঁহারা ভার্সাই সন্ধি অনুসারে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসনের পৃষ্ঠপোষকতায় পৃথিবী হইতে সমস্ত প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ ও অশান্তি দূর করিবার জন্য এবং প্রত্যেক জাতির আত্মস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লীগ অব নেশন্স বা বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ গঠন করিতেছিলেন—তাঁহারাই সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ ও জারতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহাদিগকে হটিয়া আসিতে হইল এবং ১৯২২ সালের মধ্যে বহিঃশত্রুর আক্রমণের ও গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিল। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ইহার অব্যবহিত পরেই সমস্ত রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুতার সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ঘোষণা করিলেন। এমন কি, যে সমস্ত রাষ্ট্র সদ্য সদ্য রাশিয়াকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গেও

সদ্ভাবপূর্ণ সহযোগিতা স্থাপনের জন্য পররাষ্ট্রীয় নীতি অবলম্বিত হইল। লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট পার্টির দশম কংগ্রেস হইতে ঘোষণা করা হইল ঃ—

"For three years the Capitalist powers attempted to overthrow the Soviet Government by means of armed attacks, to reduce Russia to the role of a colony and thereby to convert Russian raw materials and Russian workers and peasants into a source of profit for foreign capital. Through the heroic efforts of the toilers, the Soviet Republic repulsed these attempts, thereby gaining for itself the possibility of entering into communication with the Capitalist States as an independent State on the basis of reciprocal obligations of a political and commercial character."

অর্থাৎ তিন বৎসর ধরিয়া ধনতন্ত্রবাদী শক্তিসমূহ সশস্ত্র আক্রমণের দ্বারা সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টকে ধ্বংস ও রাশিয়াকে একটি উপনিবেশে পরিণত করিতে চাহিয়াছিল। রাশিয়ার কাঁচামাল এবং শ্রমিক ও কৃষকদিগকে খাটাইয়া বিদেশী মূলধনের মুনাফা অর্জনই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু শ্রমিক-সাধারণের সাহসিকতাপূর্ণ চেষ্টার দ্বারা সোভিয়েট রাষ্ট্র এই সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে এবং ধনিক রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে। পরস্পরের প্রতি রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক দায়িত্ব পালনের ভিত্তিতে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবেই রাশিয়া অপর রাষ্ট্রের সহিত এই যোগাযোগ স্থাপন করিবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বিপ্লবের অব্যবহিত পর হইতেই রাশিয়া ধনিক রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে, এমন কি তাহার শত্রুদের সঙ্গেও শান্তির সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। এমন কি বৃটেন, ফ্রান্স ইত্যাদি শক্তিবর্গের সদ্য সদ্য আঘাত সহ্য করিয়াও সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট তাহাদের সম্পর্কে শান্তি-নীতি অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছেন। বিভিন্ন দেশের শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মনে মনে রাশিয়ার যে অবিশ্বাস, ভীতি কিম্বা সন্দেহ থাকুক না কেন, বাহিরের কোন কার্য ও আচরণে রাশিয়া সাধারণতঃ শান্তিভঙ্গের দৃষ্টান্ত দেখায় নাই, কোন প্রতিশ্রুতিও সহসা ভঙ্গ করে নাই। বরং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত সর্ব-প্রকারে ইউরোপীয় শান্তি রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে এবং মহাযুদ্ধের মিত্র হিসাবেও তাহার দায়িত্ব পালনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা

করিয়াছে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ 'পররাষ্ট্র সমাজে' অপাংক্তেয় ছিল, 'চাষী মজুরের দেশ'কে অনেকে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট বলিয়াই স্বীকার করেন নাই। ১৯১৯ সালের ভার্সাই শান্তি-সন্ধির ঐতিহাসিক সম্মেলনে রাশিয়াকে আমন্ত্রণ করা হয় নাই, যেমন হয় নাই ১৯৩৮ সালের চেকোশ্লোভাকিয়া সংকটের সময়। ১৯২৪ সালে গ্রেট বৃটেনের প্রথম শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েট রাষ্ট্রকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়াছিলেন, তারপর ইতালী এবং ফ্রান্স। কিন্তু বৃটেনের সহিত এই সম্পর্কও মাঝখানে ভাঙিগয়া গেল রক্ষণশীলদের শত্রুতার জন্য। ১৯২৪ সালের "জিনোভিয়েভ" জালপত্র আবিষ্কারের পর ১৯২৭ সালের মে মাসে লণ্ডনের সোভিয়েট বাণিজ্য দূতাবাসে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা পুলিশ হানা দিল (Arcos Raid) এবং আন্তর্জাতিক শিষ্টাচার লংঘন করিয়া গ্রেপ্তারি ও খানাতল্লাসী চালাইল। প্যারিস এবং বার্লিনের সোভিয়েট বাণিজ্য দূতাবাসেও অনুরূপ হানা ও তল্লাসী ঘটিল। অথচ এত তল্লাসী এবং অনুসন্ধানের পরও তাঁহারা সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে দোষাবহ কিছু আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। বৃটেনের টোরি গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েট ইউনিয়নের সংগে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। আর আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হুভারের আমলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছিল অসামান্য, যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপে খাদ্য সাহায্য দেওয়ার ভার ছিল হুভারের উপর। তিনি এই সাহায্য হইতে দুর্ভিক্ষপীড়িত রাশিয়াকে বঞ্চিত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এবং তাঁহার দলবল দীর্ঘকাল আমেরিকাকে 'সোভিয়েটের ছোঁয়াচ' হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন। এমন কি, ইউরোপে হিটলারের অভ্যুদয় পর্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে স্বীকৃতি দিতে পর্যন্ত রাজী ছিল না। মাত্র ১৯৩৩ সালের ১৬ই নভেম্বর মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েট রাষ্ট্রকে কূটনৈতিকভাবে স্বীকার করিয়া লইলেন। সেদিন মহাপ্রাণ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট রাশিয়ার পররাষ্ট্রসচিব ম্যাক্সিম লিটভিনোফের নিকট যে পত্র দিয়াছিলেন, আজিকার রুশ-মার্কিণ সম্পর্কের শোচনীয় পরিণতির দিনে তাহা বিশেষভাবে স্মরণীয়। রুজভেল্ট এই বাণী পাঠাইলেন ঃ—

'I trust that the relations now established between our peoples may forever remain normal and friendly, and that our nations henceforth may co-operate for their mutual benefit and for the preservation of the peace of the world.'

মহাপ্রাণ রুজভেল্ট আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার পরেই

পৃথিবীর শান্তি রক্ষার জন্য রাশিয়ার সহিত সদ্ভাব ও সহযোগিতা রক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যাহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আরও আন্তরিক এবং আরও ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রধানতম প্রতিরোধকারী শক্তি সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে আজিকার পশ্চিমী গণতন্ত্রবাদিগণ কি ব্যবহার করিয়াছেন? ১৯৩৯ সালে তাঁহারা রাশিয়াকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া জার্মাণীর আক্রমণের মুখে ঠেলিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, যাহার জন্য ইতিহাসখ্যাত রুশ-জার্মাণ অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। তারপর হিটলারী রণতাণ্ডবে পশ্চিম ইউরোপ বিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও বৃটেন ও ফ্রান্সের শক্তিশালী সামরিক ও শাসক মহল রাশিয়াকে জব্দ করিবার ফিকির খুঁজিতেছিলেন। বিশেষভাবে জার্মাণীর সহিত আকস্মিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর ইঙ্গ-ফরাসী প্রচারকারী একেবারে আদাজল খাইয়া লাগিয়া গেলেন। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে জার্মাণী এবং ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। কিন্তু ৮ মাসকাল পশ্চিম রণাঙ্গনে কোন যুদ্ধ ছিল না, একমাত্র 'বাচনিক লড়াই' ছাড়া। জার্মাণীর দুর্দান্ত ফ্যাসিষ্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে যথোচিত সামরিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া বাধাদান করিতে না পারিলেও ফিনল্যাণ্ড ও রাশিয়ার যুদ্ধ উপলক্ষে জেনারেল ম্যানারহাইমকে সাহায্য দেওয়ার জন্য বৃটেন ও ফ্রান্সের সামরিক মহল একাধিক প্ল্যান চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সময় জেনারেল গ্যামেলাঁ ছিলেন ফরাসী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে কয়েকটি দলীল উদ্ধৃত করিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, ১৯৩৯-৪০ সালের শীতকালে ফিনল্যাণ্ডের ভিতর দিয়া উত্তর দিকে এবং মধ্যপ্রাচ্য হইতে ককেশাসের ভিতর দিয়া দক্ষিণ দিকে রাশিয়াকে আক্রমণ করিবার মতলব ইঙ্গ-ফরাসী কর্তৃপক্ষের ছিল। জেনারেল ওয়েগাঁ (গ্যামেলাঁর পর ফরাসী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি) এই চক্রান্তের একজন বড় পাণ্ডা ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে যেমন সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছিল, তেমনই পশ্চিমী শক্তিবর্গ ফিনল্যাণ্ডকে কামান, বিমান, গোলাগুলী, মেসিনগান ও অন্যান্য সাজসজ্জা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। অথচ এই সাহায্য তাঁহারা দিতেছিলেন তখন, যখন উপযুক্ত সামরিক সম্ভারের অভাবে বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনী হিটলারী আক্রমণের মুখে কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়াছিল। একমাত্র সোভিয়েট বিদ্বেষ ছাড়া ইহার অন্য কোন কৈফিয়ৎ ছিল না। ১৯৪২ সালে যখন জার্মাণীর ভয়াবহ জয় ও অগ্রগতিতে রাশিয়া নিদারুণ সংকটে পড়িয়াছিল, তখনও ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হইল না এবং ইহার জন্য

প্রধানতঃ দায়ী ছিলেন মিঃ চার্চিল ও তাঁহার পরামর্শদাতাগণ। অথচ তখন রাশিয়ার দুঃখে ইঁহাদের চোখে করুণার বান ডাকিয়াছিল।

এভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষভাগ হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসরের ইতিহাস সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, ধনতান্ত্রিক শক্তিবর্গ সোভিয়েট রাশিয়াকে কখনও বিশ্বাস করে নাই, আন্তরিকতার সহিত তাহাকে বন্ধুর মত গ্রহণ করে নাই এবং রাশিয়ার সর্বপ্রকার শান্তি চেষ্টা সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে তাহার বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত চলিয়া আসিয়াছে। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে সোভিয়েট রাষ্ট্রের জন্মলগ্নে ধনতান্ত্রিক জগতের যে ক্রুদ্ধ অভিশাপ তাহার উপর বর্ষিত হইয়াছিল, সেই অভিশাপ হইতে আজও রাশিয়া রেহাই পায় নাই। সুতরাং সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টও যদি পাল্টা তাঁহাদিগকে বিশ্বাস না করেন, তবে, কেবলমাত্র 'লৌহ যবনিকার' প্রচারকার্যের দ্বারা ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হইবে না। সোভিয়েট সরকারের পররাষ্ট্রনীতি অনুধাবন করিতে হইলে উহার বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক শক্তিবর্গের অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্রের পশ্চাদ্বর্তী ইতিহাসও স্মরণে রাখা দরকার। কেননা, আজও বিভিন্ন দেশের শাসকমহলে উহার ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে।

আত্মরক্ষার সন্ধানে, ১৯১৭-৩৩ সাল

প্রথম মহাযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত এবং বিধ্বস্ত জারের সাম্রাজ্যকে যাঁহারা সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের দ্বারা কাড়িয়া লইলেন, তাঁহাদের সম্মুখে অনিবার্যরূপেই দেখা দিল শান্তি ও আত্মরক্ষার প্রশ্ন। শান্তি ছাড়া নূতনতর বৈপ্লবিক রাষ্ট্র ও সমাজ-সংগঠন গড়িয়া তোলা সম্ভব ছিল না এবং নির্বিঘ্নতার উপায় সন্ধান ছাড়া শিশু রাষ্ট্রকে রক্ষা করাও সম্ভব ছিল না। সুতরাং লেনিনের সম্মুখে প্রথমেই এক দুঃসাহসিক প্রশ্ন দেখা দিল এবং তাহা হইতেছে জার্মাণীর সহিত যুদ্ধের অবসান। 'শান্তি, রুটি ও জমি' এই শ্লোগানের সঙ্গে 'no annexations, no indemnities', —এই নূতন নীতি ঘোষিত হইল শান্তির আবেদনে, যাহার ফলে বিপ্লবী সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রথম ঐতিহাসিক দলীল স্বাক্ষরিত হইল ব্রেষ্ট-লিটোভস্ক সহরে। অত্যন্ত মূল্য দিয়া, এমন কি নীতি ও অসম্মান সহ্য করিয়াই জার্মাণীর সহিত লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট এই শান্তি-সন্ধি রচনা করিলেন, যাহার বিরুদ্ধে ট্রট্স্কি এবং অন্যান্য কয়েকজন

প্রবল আপত্তি তুলিয়াছিলেন। একমাত্র লেনিনের মত দুঃসাহসিক ও তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিসম্পন্ন নেতা ছাড়া ১৯১৮ সালের ৩রা মার্চ তারিখ ব্রেষ্ট-লিটোভস্কের শান্তি-সন্ধি স্বাক্ষর করা বোধ হয় আর কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না। এই শান্তি-সন্ধি স্বাক্ষরের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আত্মরক্ষা এবং বিপ্লবী গভর্ণমেণ্টকে নিঃশ্বাস ফেলিবার জন্য সুযোগ দান। বলা যাইতে পারে ব্রেষ্ট-লিটোভস্ক সহরেই সোভিয়েট রাশিয়ার প্রথম পররাষ্ট্রীয় নীতির স্বাক্ষর, যাহার মুখ্য কথা শান্তি ও আত্মরক্ষার সন্ধান—যাহা ১৯১৭ সাল হইতে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত প্রথম পর্যায় অতিক্রম করিয়া ইউরোপের হিটলারী আমলের দ্বিতীয় পর্যায়ে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

কিন্তু সোভিয়েট স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই নিরাপত্তার অনুসন্ধান কেবল কমিউনিষ্ট গভর্ণমেণ্টেরই বৈশিষ্ট্য ছিল না, ইহার বীজ পুরাতন জার আমলের ইতিহাসের মধ্যেও লুকানো ছিল—যদিও নূতনতর পররাষ্ট্রীয় নীতির মধ্যে শীঘ্রই বৈপ্লবিক রূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং তাহা হইতেছে তাহার "গণ-তান্ত্রিক শান্তি" প্রতিষ্ঠার দাবীর মধ্যে। কিন্তু পুরাতন রাশিয়ার ইতিহাস সংগ্রাম ও বিস্তৃতির ইতিহাস, যাহার বয়স অন্ততঃ ৫০০ বৎসর! জনৈক লেখক বলিতেছেন ঃ—

"The Russian State grew through five hundred years' constant warfare from a small frontierless principality on the steppes of Eurasia to an empire stretching from the Vistula to the Yellow Sea and from the Arctic Circle to the Caucasus. In no case the expansion was peaceful, save in the direction of Siberia where peasants, not soldiers, were the vanguard. For the rest, at the cost of heavy fighting and often heavy defeat, Russia gradually pushed back her frontiers until they came to rest on the natural geographical boundaries of seas or great rivers." (রুশ পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে Oxford Pamphlet, 1939)

সহজ কথায়, ইউরেশিয়ার এক ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড হইতে দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দীর নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহের ফলে বিশাল রুশ সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে, যাহার সীমানা ভিশ্চুলা নদী হইতে পীতসাগর এবং উত্তর মেরু সীমান্ত হইতে ককেশাস পর্যন্ত বিস্তৃত। সাম্রাজ্যের এই বিস্তার কখনও শান্তিপূর্ণ ছিল না, একমাত্র সাইবেরিয়ার দিকে ছাড়া, যেখানে সৈন্যের বদলে কৃষকেরাই ছিল পুরোগামী। বাকি অংশ

গড়িয়া উঠিয়াছে প্রচণ্ড যুদ্ধ ও প্রকাণ্ড পরাজয়ের দ্বারা, যাহা ক্রমশঃ সুবৃহৎ নদী বা সমুদ্রের স্বাভাবিক ভৌগোলিক সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করে। ইহার ফলে পুরানো রাশিয়ায় জার সাম্রাজ্যের পররাষ্ট্রীয় নীতিতে এক অভিনব আত্ম-রক্ষার বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠে, আর দেখা দেয় প্রতিবেশীদের সম্পর্কে এবং বিশেষভাবে পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সম্পর্কে নিরন্তর আশংকা ও অবিশ্বাসের ভাব। উপরি-উদ্ধৃত লেখকের ভাষা অনুসরণ করিয়া বলা যাইতে পারে ঃ—

"The process left a profound mark upon Russian foreign policy. The long years of war and the hostility of the outside world to Russia's attempts to stabilize her frontiers on lines of national defence bred in her statesmen a profound distrust of their neighbours and particularly of their neighbours to the West, whose superior civilization and superior arts of war were a constant menace to Russia's relatively primitive organization. From the same distrust sprang another fundamental aspect of Russia's foreign policy, the perpetual search for security. Vast, unwieldy, ill-organized, wealthy, Russia's territories and riches seemed a permanent temptation to powerful and predatory neighbours. Thus to keep her lands intact of her frontiers inviolate was the first pre-occupation of the Russian Foreign Office."

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শত্রুতার জন্য প্রতিবেশীদের সম্পর্কে যেমন অবিশ্বাস প্রবল ছিল, তেমনই অনুন্নত ও ঐশ্বর্যশালী রাশিয়া পশ্চিমের উন্নত ও শক্তিশালী প্রতিবেশীদের কাছে এক প্রকাণ্ড লোভের বস্তু ছিল। সুতরাং রুশ-পররাষ্ট্রীয় নীতিতে সর্বদাই আত্মরক্ষা ও নির্বিঘ্নতার দাবী বড় হইয়া উঠিল। সাম্রাজ্যের সীমানা সুরক্ষিত রাখার দুর্ভাবনাই তাহার পররাষ্ট্রীয় দপ্তরের প্রথম কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইল।

পাঁচ শত বৎসরের রণক্ষত ঐতিহাসিক ভূমিতে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ব্রেষ্ট-লিটোভস্কের প্রথম শান্তি-সন্ধির মধ্যে সেই পুরাতন বীজ বপন করিলেন বটে, কিন্তু উহার ফলে ভবিষ্যতে প্রগতিশীল সোভিয়েট সমাজের নূতন পত্রপুষ্প আবির্ভাবের সুযোগ ঘটিয়াছিল। কিন্তু সেই সুযোগও আসিয়াছিল

আভ্যন্তরীণ গৃহদ্বন্দ্বের প্রচুর রক্তক্ষরণ ও বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের হস্তক্ষেপের প্রভূত লড়াইয়ের পর। দীর্ঘকাল "ছোটলোকের" দেশ রাশিয়া অভিজাত রাষ্ট্রসমাজে অপাংক্তেয় হইয়া রহিল। ১৯১৯ সালের ভার্সাই শান্তি-সম্মেলনে ইউরোপের অন্যতম প্রধান শক্তি এবং মহাযুদ্ধে শান্তির জন্য প্রথম আবেদনকারী সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট আমন্ত্রিত হইলেন না, প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের যে অধিকার মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট উইলসন ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহার মর্যাদা রক্ষিত হইল না, যদিও উইলসন ব্যক্তিগতভাবে রাশিয়াকে বর্জন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। ভার্সাই সন্ধির দ্বারা ব্রেষ্ট-লিটোভস্কের শান্তি-চুক্তি বাতিল করিয়া দেওয়া হইল এবং কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রকে উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করা হইল। উচ্ছেদ যদি সম্ভব না হয়, তবে কমিউনিজমকে যথাসম্ভব রাশিয়ার সীমানার মধ্যে আবদ্ধ রাখার জন্য মহাযুদ্ধের মিত্রপুঞ্জ ভার্সাই সন্ধির মারফৎ চেষ্টার ত্রুটি রাখিলেন না। রাশিয়ার সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলিকে বিদ্রোহে ও স্বাধীনতালাভে উস্কানি ও সাহায্য দেওয়া হইল। অবশ্য ব্রেষ্ট-লিটোভস্কের চুক্তির দ্বারা লেনিন গভর্ণমেণ্ট রাশিয়ার বাল্টিক রাজ্যের প্রদেশ-গুলি এস্থেনিয়া ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং ফিনল্যাণ্ড ও রুশীয় পোল্যাণ্ড জার্মাণীকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আর উক্রাইন এবং জর্জিয়াকে স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে স্বীকার করিতে এবং তুরস্ককে কার্স, বাটুম ও আর্দাহান প্রদেশ "পুনর্গঠন" করিতে দিতে হইয়াছিল। মহাযুদ্ধের শক্তিবর্গও এই সুযোগে লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া ও এস্থোনিয়াকে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করিলেন। পোল্যাণ্ড পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিলে—এবং তাহাও রাশিয়ার নিকট হইতে জমি কাড়িয়া লইয়া (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইহার অবসান ঘটে)—এবং ফিনল্যাণ্ডও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি পাইল। এইভাবে রাশিয়া ও বাকি ইউরোপের মধ্যে একটা বন্ধনী গড়িয়া উঠিল—রাশিয়ার চারিদিকে যেন একটা বেড়া দেওয়া হইল, এই বেড়া ডিঙ্গাইয়া কমিউনিজম যাহাতে পশ্চিমের দিকে পা বাড়াইতে না পারে! সুতরাং সোভিয়েট রাশিয়াও যে পাল্টা আত্মরক্ষার জন্য ব্যগ্র হইবে এবং ধনতান্ত্রিক শক্তিবর্গকে সন্দেহের চক্ষে দেখিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে? তথাপি নূতন রাষ্ট্রের অপরিসীম দুর্গতি এবং অভূতপূর্ব বিপদের দিনেও সোভিয়েট বিপ্লবিগণ তাঁহাদের পররাষ্ট্রীয় নীতিতে শান্তি ও স্বাধীনতাই দাবী করিলেন, কেবল নিজেদের জন্যই নহে, অধঃপতিত পরাধীন জাতিগুলির জন্যও। সেই দূরবর্তী ১৯১৮ সালে প্রেসিডেণ্ট উইলসনের উদ্দেশ্যে তাঁহারা বলিয়া পাঠাইলেন ঃ—

"আপনি পোল্যান্ড, সার্ভিয়া ও বেলজিয়মের রাষ্ট্র-স্বাধীনতা এবং অষ্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের জনগণের স্বাধীনতা দাবী করিতেছেন, কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, আপনার এই দাবীর মধ্যে আমরা কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না আয়র্ল্যান্ড, মিশর, ভারতবর্ষ, এমন কি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতার বিন্দুমাত্র উল্লেখ পর্যন্ত!" পরাধীন দেশ ও উপনিবেশগুলির পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার দাবী আজও সোভিয়েট পররাষ্ট্রীয় নীতিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যাহার ফলে রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার আন্দোলন 'সোভিয়েট সাম্যবাদের প্রসার' বলিয়া ভুল ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

গৃহযুদ্ধের অবসানের পর রাশিয়ার আর্থিক ও বৈষয়িক অবস্থা চরম দুর্দশার মধ্যে পড়িয়াছিল—শিল্প-বাণিজ্যের তো কথাই নাই। সুতরাং নয়া অর্থনৈতিক নীতি (New Economic Policy) যেমন গ্রহণ করিতে হইল, তেমনই বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানিরও দরকার হইল। আবার অন্য দিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের অবস্থাও শোচনীয় ছিল। রাশিয়ার নূতন অর্থনৈতিক কর্মপদ্ধতি সোসিয়েলিজমের অবসান মনে করিয়া এবং সেখানকার বাজারে ইঙ্গ-ফরাসীর বাণিজ্যগত আধিপত্য লাভ সম্ভব হইবে ভাবিয়া লয়েড জর্জের নেতৃত্বে এই সময় জেনোয়াতে একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলন আহূত হইল এবং তাহাতে রাশিয়াকে সরকারীভাবে আহ্বান করা হইল। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মঃ চিচেরিণ বলিলেন যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক যোগাযোগ এবং বিদেশী পণ্যের জন্য (বিশেষভাবে যে সমস্ত দেশে বেকার সমস্যা প্রবল) রাশিয়া তাহার সীমান্তের দ্বার খুলিয়া দিতে প্রস্তুত, কিন্তু যুদ্ধের আবহাওয়ায় ও সামরিক আশঙ্কার মুখে এই ধরণের বাণিজ্যের প্রবর্তন করা সম্ভব নহে। অতএব রাশিয়া এই সম্মেলনে সামরিক অস্ত্র সীমাবদ্ধকরণের প্রস্তাব উত্থাপনে উৎসুক। বলা বাহুল্য যে, এই সমস্ত প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য হইল। কিন্তু ভার্সাই-সন্ধির নিগড়ে আবদ্ধ ১৯২২ সালের জার্মাণী রাশিয়ার সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনে সম্মত হইল। ফলে দুই দেশের মধ্যে র‍্যাপালো শান্তি সন্ধি (Rapallo Treaty) স্বাক্ষরিত হইল এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতর বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। কিন্তু জেনোয়া সম্মেলনে সামরিক অস্ত্র সম্পর্কে ব্যর্থতার পরও রাশিয়া নিশ্চেষ্ট রহিল না। ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে রাশিয়া তাহার সীমান্তবর্তী ইউরোপীয় রাজ্যগুলিকে একটি অস্ত্রহ্রাস সম্মেলনে আহ্বান করিল রাজধানী মস্কো সহরে এবং এই সম্মেলনে প্রায় অধিকাংশ সীমান্তবর্তী রাজ্যের প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন। রাশিয়া সমস্ত সামরিক অস্ত্রের শতকরা ৭৫ ভাগ হ্রাসের

প্রস্তাব করিল। অবশ্য এই প্রস্তাব গৃহীত হইল না, বিশেষভাবে পোল্যাণ্ডের বিরোধিতার জন্য। কিন্তু রাশিয়া সম্পর্কে এই তথ্য অনেকেরই জানা নাই যে, পরবর্তীকালে জেনেভাতে এবং আধুনিক কালে ইউ-এন-ও'তে সামরিক অস্ত্র হ্রাস ও বাতিল করা লইয়া যে তুমুল আলোড়ন ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছে, উহার প্রথম উদ্যোক্তা ১৯২২ সালের সোভিয়েট রাশিয়া এবং তাহারা নিজেরাই এই প্রস্তাব করিয়াছিল—এমন কি অস্ত্রহ্রাস সংক্রান্ত বিরোধে সালিশী বিচার মানিয়া লইতে পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। পররাষ্ট্রীয় নীতিতে যদিও আত্মরক্ষা এই সময় সর্বাপেক্ষা প্রবল ছিল, তথাপি শান্তির লক্ষ্য ছাড়া এই ধরণের বৈপ্লবিক প্রস্তাব করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং ১৯২৭ সালে বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে যখন জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের প্রারম্ভিক কমিশনে রাশিয়াকে আহ্বান করা হইল, তখন সোভিয়েট সরকার দুই বৎসরের মধ্যে "সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের" এক 'অদ্ভুত' প্রস্তাব পেশ করিয়া সকলকে হতবুদ্ধি করিয়া দেন। বলা বাহুল্য যে, ইহা অগ্রাহ্য হইল। তখন চারি বৎসরের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ অস্ত্রহ্রাসের প্রস্তাব করা হইল, কিন্তু তাহাও অগ্রাহ্য হইল। ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে যখন নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের পূর্ণ অধিবেশন সুরু হইল, তখন আমেরিকা পূর্বেকার সোভিয়েট প্রস্তাবের অনুসরণে সামরিক অস্ত্রের এক-তৃতীয়াংশ হ্রাসের প্রস্তাব করিলেন এবং রাশিয়া তাহা সমর্থন করিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে যখন আমেরিকার প্রস্তাব আলোচনার জন্য পেশ করা হইল, তখন সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ লিটভিনোফ উহা দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করিলেন বটে, কিন্তু মার্কিণ প্রতিনিধিরাই উহার বিরোধিতা করিলেন এবং ভোটের দ্বারা সেই বিরুদ্ধতা হাতে-কলমে প্রমাণিত করিলেন!

রাশিয়া কেন এই ধরণের বিপ্লবাত্মক প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে? কারণ, সোভিয়েট রাশিয়া কখনও যুদ্ধ চাহে নাই; যুদ্ধ শান্তিপূর্ণ সংগঠনের ও প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের একান্ত বিরোধী। সুতরাং সে চাহিয়াছে আত্মরক্ষা, চাহিয়াছে নির্বিঘ্নতা—ঘরে ও বাহিরে শান্তি। এই নীতি অনুসরণ করিয়া ১৯১৯ সালেই আফগানিস্থানে তাহার বিশেষ অধিকারের দাবী পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ১৯১৭ সালের ৮ই নভেম্বর লেনিনের সেই বিখ্যাত "শান্তির নির্দেশনামায়" (Decree on Peace) ঘোষিত হইয়াছিল—

"We shall not allow ourselves to be enmeshed by treaties. We reject all clauses dealing with plunder and violence, but

we shall welcome all clauses containing provision for friendly relations and economic agreements."

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের সন্ধির নামে "হিংসা ও লুণ্ঠনের" সর্তসমূহ পরিত্যক্ত হইল, যুদ্ধের বিরোধিতা, বন্ধুতা ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের যুগ প্রবর্তিত হইল। এই নীতি অনুসরণ করিয়া ১৯২১ সালে পারস্য (ইরাণ), আফগানিস্থান ও তুরস্কের সঙ্গে এবং ১৯২৪ সালে চীনের সঙ্গে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। পারস্যে জারের রাশিয়ার যে সমস্ত সুবিধা, অধিকার এবং সর্ত ইত্যাদি ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করিয়া দেওয়া হইল।

এদিকে ইউরোপে লোকার্ণো চুক্তির (১৯২৫, অক্টোবর) 'শান্তি রক্ষার যুগ' দেখা দিল, যাহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল জার্মাণীকে কমিউনিষ্ট রাশিয়ার ছোঁয়াচ হইতে বাঁচানো এবং এজন্য রাশিয়াকে বাদ দিয়া প্রধানতঃ 'পশ্চিম ইউরোপের নির্বিঘ্নতার' জন্য এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল। পারস্পরিক সামরিক মৈত্রীও এই চুক্তির অন্তর্গত ছিল। ১৯২৪ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত এই বাহ্যিক শান্তির যুগ অব্যাহত ছিল, যখন জেনেভায় বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের দপ্তর আন্তর্জাতিক হিতৈষণায় মুখর ছিল এবং আমেরিকা হইতে উত্থিত হইল যুদ্ধ-বিরোধিতার এক নূতন প্রস্তাব। মিঃ কেলগ ফ্রান্সের মঃ ব্রিয়াঁর সঙ্গে একত্রে যুদ্ধকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং আন্তর্জাতিক বিরোধকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসাই একমাত্র পথ বলিয়া নির্দেশ করিলেন। ব্রিয়াঁ-কেলগ বা ফ্রাঙ্কো-মার্কিণ চুক্তির এই ঘোষণা সর্বাগ্রে মানিয়া লইলেন সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট। রাশিয়া এক নূতন অনাক্রমণ চুক্তির যুগে অবতীর্ণ হইল। ১৯২৯ সালে কেলগ-ব্রিয়াঁ চুক্তি অনুসারে ল্যাটভিয়া, এস্থোনিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, তুরস্ক ও পারস্যের সঙ্গে রাশিয়া 'যুদ্ধ বর্জনের' প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষর করিল। পররাষ্ট্রীয় নীতিতে তখন অনাক্রমণ চুক্তিই প্রাধান্য অর্জন করিল এবং ১৯৩০ ও ১৯৩১ সালে রাশিয়া তাহার সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির সঙ্গে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। ফ্রান্স এবং ইতালীর সঙ্গেও অনুরূপ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল (যদিও ইতালীর সঙ্গে স্বাক্ষরের তারিখ ছিল ১৯৩৩ সাল) এবং জার্মাণীর সঙ্গে পূর্বেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একমাত্র সুদূরপ্রাচ্যে জাপানের সঙ্গে রাশিয়া শান্তি স্থাপন করিতে পারিল না। প্রকৃতপক্ষে ১৯২১ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার পূর্ব (সাইবেরিয়া) সীমান্ত জাপানের দিক হইতেই অধিকতর বিপন্ন ছিল এবং রাশিয়া বার বার অনাক্রমণ চুক্তি করিতে গিয়া ব্যর্থ হইল।

১৯১৭ সালে সোভিয়েট বিপ্লবের পর হইতে ১৯৩৩ সালে ইউরোপে ফ্যাসিষ্ট দৌরাত্ম্যের আরম্ভ পর্যন্ত রাশিয়া একাদিক্রমে তাহার পররাষ্ট্রীয় নীতিতে শান্তি ও নির্বিঘ্নতার সন্ধান করিয়াছে। কিন্তু উহা স্বাতন্ত্র্যের বিনিময়ে শান্তি কিম্বা বৈপ্লবিক আদর্শের বিনিময়ে নির্বিঘ্নতার সন্ধান ছিল না, ছিল যুদ্ধ ও হিংসার বিরোধিতার দ্বারা প্রগতিমূলক আত্মপ্রতিষ্ঠালাভ এবং জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ বৈষয়িক উন্নতির দ্বারা বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনার প্রবর্তন। ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত গেল আত্মরক্ষার প্রথম পর্ব এবং তারপর আর একটি ঐতিহাসিক যুগ দেখা দিল, যাহা গিয়া পেঁাছিল ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত।

১৯৩৩-৩৯ সালের সমষ্টিগত নিরাপত্তা

১৯৩১ সালে জাপান এশিয়াখণ্ডে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিল, ১৯৩৩ সালে হিটলারী দল ইউরোপে জার্মাণ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিল এবং ১৯৩৫ সালের মুসোলিনীর ইতালী উত্তর আফ্রিকার আবিসিনিয়া আক্রমণ করিল। আন্তর্জাতিক জগতে এক নূতন ফ্যাসিষ্ট দৌরাত্ম্যের যুগ দেখা দিল। কিন্তু উহার আগে আরও দুইটি যুগান্তকারী ঘটনার সমাবেশ হইল, যাহা ত্রিংশ-দশকের ইতিহাসে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিল। উহার একটি হইতেছে ১৯২৯ সালের শেষভাগ হইতে পৃথিবী-ব্যাপী আর্থিক সংকট ও বাজার-মন্দার সুরু এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে ১৯২৮ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রথম পঞ্চম-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রবর্তন। এই দুইটি ঘটনার ফলাফল কি দাঁড়াইল? ১৯২৯ সাল হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশে বৎসরের পর বৎসর কল-কারখানার উৎপাদন হ্রাস এবং ভয়াবহ দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যা দেখা দিল—শ্রমিক, কৃষক ও চাকুরীজীবীর দল শোচনীয় আর্থিক দুর্গতি ও অনটনের মধ্যে পড়িল। ১৯৩৩ সালে একমাত্র গ্রেট-বৃটেনে ৩০ লক্ষ, জার্মাণীতে ৫০ লক্ষ এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটি লোক বেকার হইল। ইহার সঙ্গে অর্ধ-বেকারের সংখ্যা এক কোটি ও অগণিত নিঃস্ব লোকের সংখ্যা যোগ দিলে ১৯৩৩ সালে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মোট বেকারের সংখ্যা ছিল ৩ কোটিরও অধিক। বিভিন্ন পরাধীন দেশ ও উপনিবেশগুলির অবস্থা ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই। কেন না, তাহাদের দারিদ্র্যের কোন পরিমাপ নাই। ১৯৩৩ সালের এই অবস্থা হইতে ত্রাণ পাওয়ার জন্য নূতন বাজার ও উপনিবেশ দখল এবং ফ্যাসিষ্ট দেশগুলিতে যুদ্ধায়োজনের হুজুগ দেখা দিল। এক কথায় জেনারেল গোয়েরিংয়ের

ভাষায় বলা যাইতে পারে— Guns, not butter'. 'মাখন নয়, কামান চাই'—এই শ্লোগান দেখা দিল। ইহার ফলে সমরোৎপাদনের কল-কারখানাগুলি চালু হওয়ায় ১৯৩৭ সালে বেকারের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ১ কোটি ৪০ লক্ষে দাঁড়াইল, কিন্তু পরের বৎসর আবার উহা ১ কোটি ৮০ লক্ষে দাঁড়াইল এবং এই অবস্থাই চলিতে লাগিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত। অর্থাৎ জার্মাণী, জাপান ও ইতালী যে মহা-যুদ্ধের সূত্রপাত করিল, উহার অন্যতম কারণ ধনতান্ত্রিক জগতের আর্থিক সংকট ও বেকার-সমস্যা এবং কাঁচামাল ও উপনিবেশের দাবী। অন্যদিকে সোভিয়েট রাশিয়া বিজ্ঞানসম্মত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রবর্তন করিল, যাহার মধ্যে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন ও জাতিগত শোষণ ছিল না। ১৯২৮ সালের ১লা অক্টোবর হইতে ১৯৩২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর গেল এই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়। ১৯৩৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ গেল দ্বিতীয় পর্যায় এবং তৃতীয় পর্যায়ের মেয়াদ ছিল ১৯৩৮ হইতে ১৯৪২ সাল, যখন দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের জন্য উহা ব্যাহত হইল। পর পর এই পরিকল্পনাগুলির দ্বারা রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ জীবনে বিস্ময়কর উন্নতি ঘটিতে লাগিল, যাহা তাহাদের জনসাধারণের বিগত বহু-শতাব্দীর ইতিহাসে কোনদিন প্রত্যক্ষ করা যায় নাই। সোভিয়েট রাশিয়াতে একজন লোকও বেকার রহিল না! অর্থাৎ দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার অভিশাপ সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া গেল এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রা শোষণ ও অনটন হইতে মুক্ত হইবার ফলে জাতিগত পুনর্গঠনের কাজ—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, গৃহ এবং অন্ন-বস্ত্রের উন্নতি অতীত দিনের তুলনায় অভূতপূর্বরূপে বৃদ্ধি পাইল। এককথায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আশীর্বাদে সোভিয়েট রাশিয়ার যেন পুনর্জন্ম ঘটিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী বৎসর ১৯১৩ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার শ্রম-শিল্পের প্রসার ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল মোটামুটি হিসাবে ৯ গুণেরও অনেক বেশী! আর আমেরিকা, বৃটেন, জার্মাণী ও ফ্রান্সের মাত্র শতকরা ২০ ভাগ হইতে ৩০ ভাগ! বৃহৎ শ্রম-শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রগতির ফলে ইতিমধ্যে রাশিয়ার আত্মরক্ষা বা সামরিক শক্তিও বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল, অথচ দেশের সর্বাঙ্গীণ সামাজিক উন্নতিও নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করিল।

১৯২৮-৩৮ সালের রুশ সমাজ-জীবনের এই আভ্যন্তরীণ চিত্র বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার এজন্য যে, ইহার সংগে রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কারণ, কোন দেশের বৈদেশিক নীতিই স্বদেশীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, বরং বাহিরের নীতি ঘরের অবস্থারই প্রতিফলিত রূপ মাত্র। এজন্যই সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত তুলনায় ধনতান্ত্রিক দেশগুলি ক্রমশঃ পিছাইয়া

পড়িতে লাগিল—দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার সঙ্গে নিদারুণ রাজনৈতিক অসন্তোষ, কল-কারখানায় ধর্মঘট ও হট্টগোল এবং বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের ভাব দেখা দিতে লাগিল। আর সেই সঙ্গে জনগণের অসন্তোষ দমনের জন্য পুলিশ ও মিলিটারীর রাজত্ব এবং পররাষ্ট্রীয় নীতিতে উগ্রতা ও সামরিকবাদ। বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশ এবং বিশেষভাবে জার্মাণী, জাপান ও অন্যান্যের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে ষ্ট্যালিন বলিলেন—"Chauvinism and preparation for war as the main elements of foreign policy; repression of the working class and terrorism in the sphere of home policy as a necessary means for strengthening the rear with a view to future wars—that is what is now particularly engaging the minds of contemporary imperialist politicians." (ষ্ট্যালিন প্রণীত 'Problems of Leninism' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থায় এই সংকটের জন্য তাহাদের পররাষ্ট্রীয় নীতিও শান্তিপূর্ণ হইতে পারিল না, বরং উহা ক্রমশঃ বিপরীত দিকে বা যুদ্ধের অভিমুখে ঝুঁকিতে লাগিল—যে অবস্থার বর্ণনায় ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন,—"...that it is no longer able to find a way out of the present situation on the basis of a peaceful foreign policy, and that as a consequence, is compelled to resort to a policy of war." (১৯৩৪ সালের এই অবস্থার সঙ্গে ১৯৫১ সালের কি মিল নাই?)

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ স্ববিরোধিতা ও দ্বন্দ্বের জন্য আর একটি বিচিত্র অবস্থার উদ্ভব হইল। অর্থাৎ তাহাদের নিজেদের মধ্যে দুইটি পৃথক শিবির দেখা দিল—ধনবানদের শিবিরে ছিল আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স ইত্যাদি এবং ধনলোভীদের শিবিরে জুটিল জার্মাণী, ইতালী, জাপান ইত্যাদি, ইংরাজী রাজনৈতিক পরিভাষায় যাহারা "haves" এবং "have-nots" নামে পরিচিত ছিল। একপক্ষের বিরাট বাণিজ্য, মূলধন এবং রাজ্য ও উপনিবেশ ছিল এবং অপরপক্ষ নূতন করিয়া এগুলির সন্ধান করিতে লাগিল। সুতরাং ইহারা পরস্পর আবার 'আক্রমণকারী' ও 'আক্রান্ত' পক্ষে পরিণত হইতে লাগিল—এই শেষোক্ত দলভুক্তরূপে বৃটেন ও ফ্রান্স 'Status quo' বজায় রাখিবার জন্য বাহ্যিক যুদ্ধ পরিহার ও কার্যতঃ তোষণনীতি অনুসরণ এবং মৌখিকভাবে দুনিয়ার শান্তি ও লীগ অব নেশন্সের দোহাই দিতে লাগিল।

এই সময়কার ইতিহাস অত্যন্ত ঘটনাবহুল, নাটকীয় ও চাঞ্চল্যকর—যাহা বর্তমান শতাব্দীর এক প্রকাণ্ড অধ্যায় এবং যে অধ্যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে গিয়া শেষ হইল। কিন্তু ১৯৩১ সালে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণে ইহার সূত্রপাত এবং ১৯৩৩ সালে হিটলার কর্তৃক ক্ষমতালাভের দ্বারা এই মহানাটকের নান্দীপাঠ সুরু হইল। অপরদিকে ধনতান্ত্রিক জগতের আর্থিক সংকট এবং রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ সামাজিক প্রগতির ভিত্তি-পত্তন—এই প্রকার অভূতপূর্ব অবস্থার মধ্যে রাশিয়া পররাষ্ট্রীয় নীতির আর এক যুগ-সন্ধিক্ষণে পৌঁছিল। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাস হইতে শান্তি ও আত্মরক্ষার সন্ধানে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন রাজ্য এবং বিশেষভাবে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির সঙ্গে—যেমন, আফগানিস্থান, এস্থোনিয়া, ল্যাটভিয়া, পারস্য, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া তুরস্ক ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন বটে, কিন্তু তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইল না। ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে সম্পাদিত এই সমস্ত চুক্তির মধ্যে আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইহাতে 'আক্রমণকারী' বা 'Aggressor' শব্দটির সংজ্ঞা লীগ অব নেশন্সের সংজ্ঞার চেয়েও ব্যাপকতর ও অধিকতর সুনির্দিষ্ট আকারে গ্রহণ করা হইল। (Pat Sloan প্রণীত "Russia—Friend or Foe" গ্রন্থের ৫৬—৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ইহা দ্বারা রাশিয়ার শান্তিনীতির আন্তরিকতা প্রমাণিত হইল বটে, কিন্তু রাশিয়ার পূর্ব সীমান্তে জাপান ও পশ্চিম সীমান্তে জার্মাণীর উগ্র সামরিকবাদ প্রতিহত করিবার পক্ষে নিশ্চয়ই ইহা যথেষ্ট ছিল না—বিশেষতঃ হিটলার যখন তাঁহার আত্ম-জীবনীতে স্পষ্টই ঘোষণা করিলেন যে, জার্মাণীর রাজ্য বিস্তার করিতে হইলে বলসেভিক রাশিয়ার সীমান্তবর্তী "তাঁবেদার দেশগুলি" এবং সম্পদশালী উক্রাইনের দিকে হাত বাড়াইতে হইবে। সুতরাং রুশ পররাষ্ট্রীয় নীতি শান্তি ও নির্বিঘ্নতার অপরিবর্তনীয় লক্ষ্য বজায় রাখিয়া এক নূতনতর যুগে প্রবেশ করিল—পশ্চিমের ধনতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সহযোগিতা এবং লীগ অব নেশন্স বা বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রবেশ। এই সমস্ত ঘটনার যে ব্যাখ্যা এবং সমালোচনাই বিরুদ্ধবাদিগণ প্রচার করিয়া থাকুন না কেন, স্বদেশে এবং বিদেশে শান্তিরক্ষাই সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের প্রধানতম লক্ষ্য ছিল এবং ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর কমিউনিষ্ট পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেসে ষ্ট্যালিন রুশ পররাষ্ট্রীয় নীতির ব্যাখ্যায় বলিলেন—

"I have in mind the restoration of normal relation between the U. S. S. R. and the United States. There cannot be any

doubt that this act is of great significance for the whole system of international relations. It is not only that it improves the chances of preserving peace, and that it improves the relations between the two countries, strengthens commercial intercourse between them, and creates a base for their mutual collaboration. The point is that it is a landmark between the old position, when in various countries the United States was regarded as the bulwark for all sorts of anti-Soviet trends, and the new position, when this bulwark has been voluntarily removed, to the mutual advantage of both countries."..."Our foreign policy is clear. It is a policy of preserving peace and strengthening commercial relations with all countries. The U. S. S. R. does not think of threatening anybody—let alone of attacking anybody. We stand for peace and champion the cause of peace...." ('Problems of Leninism' পৃষ্ঠা ৪৬৮-৬৯ দ্রষ্টব্য)।

আজিকার সোভিয়েট-মার্কিণ দ্বন্দ্বে পৃথিবীর শান্তি যখন বিপন্ন, তখন ১৯৩৩-৩৪ সালে আমেরিকার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ও বন্ধুতা স্থাপনের দিনে স্বয়ং ষ্ট্যালিনের মন্তব্য নিশ্চয়ই প্রণিধানযোগ্য (এই সম্পর্কে রুজভেল্টের শান্তিপূর্ণ মনোভাব প্রথম প্রবন্ধেই উল্লেখ করা হইয়াছে) এবং ১৯৫০-৫১ সালেও ষ্ট্যালিনের এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে নাই। কেন না, সোভিয়েট রাশিয়া যুদ্ধ চাহে না এবং চাহে না বলিয়াই পৃথিবীর অন্যতম প্রধান রাষ্ট্র আমেরিকার সহিত সদ্ভাব রক্ষাকে যুদ্ধ পরিহারের অন্যতম উপায় বলিয়া মনে করিয়াছিল। ষ্ট্যালিনের ধারণা ছিল যে, সোভিয়েট-মার্কিণ বন্ধুতার দ্বারা বিদ্বেষ ও সন্দেহ, মিথ্যা প্রচার ও অবিশ্বাসের ভিত্তি নষ্ট হইয়া যাইবে, পারস্পরিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পাইবে এবং সোভিয়েট-বিরোধিতা বন্ধ হইয়া গিয়া সমগ্র আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটিবে। এজন্য দ্বিধাহীন ভাষায় সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়ক বলিয়াছিলেন যে, রুশ পররাষ্ট্রনীতি অত্যন্ত স্বচ্ছ। এই নীতি হইতেছে পৃথিবীর শান্তিরক্ষা ও বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ রক্ষা। কিন্তু যুদ্ধের পাগলামির মধ্যে এই প্রকার শান্তিনীতি বজায় রাখা কত কঠিন এবং রাশিয়াকে এজন্য কি পরিমাণ বেগ পাইতে হইয়াছে, তাহা তিনি সেই বক্তৃতাতেই সকলকে (১৯৩৪ সাল) স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

এই নীতি অনুসরণ করিতে গিয়াই রাশিয়া পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র-বর্গের সহিত সহযোগিতার সন্ধান করিল এবং ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের সদস্য হিসাবে জেনেভায় যোগ দিল। নিঃসন্দেহে ইহা দ্বারা পররাষ্ট্রীয় নীতির এক চমকপ্রদ পরিবর্তন ঘটিল, যদিও সেই পরি-বর্তন মূল নীতিগত কিংবা লক্ষ্যগত ছিল না, কিন্তু পদ্ধতির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটিল। কারণ, মাত্র সাত বৎসর আগে ১৯২৭ সালে ষ্ট্যালিন জনৈক মার্কিণ সাংবাদিকের নিকট বিশ্বরাষ্ট্রসংঘকে 'যুদ্ধবাদীদের আড্ডা', 'সাম্রাজ্যবাদীয় নীতির বাহক' ও 'পদানত দেশগুলির পক্ষে পীড়াদায়ক' ইত্যাদি কড়া বিশেষণের দ্বারা নিন্দা করিয়াছিলেন। আর, পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক শক্তিবর্গের যাঁহারা প্রধান, তাঁহারাই ছিলেন রাষ্ট্রসংঘের আসল নায়ক ও মাতব্বর, যাঁহারা আবার ভার্সাই সন্ধির রচয়িতা হিসাবে ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গের আক্রোশের ভাজন ছিলেন। ১৯৩৪ সালে জার্মাণী ও জাপান (পরে ইতালীও) রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সেই রাষ্ট্রসংঘেই ঢুকিলেন ও পশ্চিমের ধনিক সরকারগুলির সংগেই একত্রে শান্তিরক্ষার আশা করিলেন। কেন?—তাঁহারা চিন্তা করিলেন যে, রাষ্ট্রসংঘের মারফৎ যুদ্ধায়োজনে "যতটুকু বাধা দেওয়া যাইতে পারে, ততটুকুই লাভ।" অর্থাৎ এ বিষয়ে তাঁহারাও খুব আশান্বিত ছিলেন না, তবে, আপাততঃ যে-কোন কারণেই হউক, যাঁহারা দুনিয়ার শান্তি ভংগ করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহাদের দলে মিশিয়া যতটা সম্ভব 'যুদ্ধের কারবারে' বাধা দেওয়াই ছিল সোভিয়েট সরকারের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণ করিতে গিয়াই তদানীন্তন খ্যাতনামা রুশ পররাষ্ট্র-সচিব মঃ লিটভিনোফ রাষ্ট্রসংঘের বৈঠকে পর পর কয়েকটি বক্তৃতায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। 'Collective Security' বা 'সমষ্টিগত নিরাপত্তা' এবং 'Peace is indivisible' বা 'শান্তি অবিভাজ্য'—এই কথা দুইটি ত্রিংশ-দশকের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছিল এবং এই দুইটির রচয়িতা স্বয়ং লিটভিনোফ। রাষ্ট্রসংঘের ১৬ ও ১৭নং বিধানে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, ইহার কোন সদস্যরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপর কোন রাষ্ট্র আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করিলে, সেই যুদ্ধকে লীগের বাকি সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করা হইবে। তখন সমবেত বা সমষ্টিগতভাবে প্রতিরোধ পন্থা অবলম্বিত হইবে। এই নীতি হইতেই লিটভিনোফ 'সমষ্টিগত নিরাপত্তার' নীতি ঘোষণা করিলেন। অর্থাৎ ছোট বা বড় যে-কোন রাষ্ট্রকে আক্রমণের সম্ভাবনা হইতে রক্ষা করিতে হইলে সমস্ত

রাষ্ট্রের সমষ্টিগতভাবে নিরাপত্তার নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ, যে কোন একটি রাষ্ট্র আক্রান্ত হইলে এবং এই কার্যে সমবেতভাবে বাধা দেওয়া না হইলে বিজয়িগণ পুনরায় অন্য কোন রাষ্ট্র আক্রমণ করিবে। সুতরাং শান্তি-রক্ষার ক্ষেত্রকে যেমন ভাগ করা যায় না, তেমনই নির্বিঘ্নতা বিধানের উদ্দেশ্যে সমষ্টিগত নীতি অবলম্বন না করিয়াও উপায় নাই।

১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে সোভিয়েট সচিব মঃ লিটভিনোফ 'সমষ্টিগত নিরাপত্তা' ও 'শান্তি অবিভাজ্য' বলিয়া যে দাবী করিলেন (এবং সেই সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণ ও সৈন্যবল হ্রাসের যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তাহাও স্মরণীয়, যদি সেগুলি লীগের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক পালিত হইত, তাহা হইলে ১৯৩০-৩৯ সালের ইতিহাস সম্ভবতঃ অন্যরূপ হইত। এমন কি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নিবারিত হওয়াও অসম্ভব ছিল না। ঘটনাবহুল সেই ইতিহাসের কেবলমাত্র উল্লেখ করিয়া বলা যাইতে পারে যে, ১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়া হইতে যে আক্রমণের সুরু (জাপান কর্তৃক), তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিল ১৯৩৫ সালে ইতালী কর্তৃক আবিসিনিয়ায়, ১৯৩৬ সালের স্পেনীয় গৃহযুদ্ধে ইতালী ও জার্মাণীর দ্বারা, ১৯৩৭ সালে উত্তর ও মধ্য চীনে জাপানের নূতন আক্রমণে এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া ও আলবেনিয়ায় জার্মাণী ও ইতালীর বলপূর্বক দখলের দ্বারা। এই সমস্ত আক্রমণের ক্ষেত্রে লীগের সদস্যবৃন্দ ইঙ্গ-ফরাসীয় কূটনৈতিক চাল, সাম্রাজ্যবাদীয় স্বার্থ এবং তোষণনীতির জন্য কখনও সমবেতভাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিধান প্রয়োগ করেন নাই, কিম্বা আন্তরিকতার সঙ্গে অগ্রসর হন নাই। কিন্তু সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন এবং লীগে যোগদানের পর হইতেই প্রতি ক্ষেত্রে বাধা দানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। মিঃ ডি এন প্রিট, কে. সি. বলিতেছেনঃ—

"In all these crises, U. S. S. R. played an honourable part; she imposed sanctions in 1935, she agreed to non-intervention in Spain when it was first proposed and afterwards, when it was flagrantly violated by Germany and Italy, declared herself freed from it by this repudiation, and assisted the Spanish Republican Government; she was the only country to help China; she proposed a firm and unambiguous stand over Austria (without response) and she was ready to carry out her undertakings to Czechoslovakia... and give her military support..."

"It was thus dificult even for the most biased critic to find anything to complain of in the policy and behaviour of the U. S. S. R. in her foreign relations prior to the year 1939, and certainly she could not be blamed for the emasculation of the League of Nations....." ('The U. S. S. R. our Ally' পুস্তিকা দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং কোন বিদ্বেষপরায়ণ নিন্দুকের পক্ষেও অন্ততঃ এই সময়কার রুশ পররাষ্ট্রীয় নীতির প্রতিবাদ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই সমস্তই ব্যর্থ হইল রাষ্ট্রসংঘ-নেতাদের একদিকে সোভিয়েট-বিদ্বেষ ও অন্যদিকে ফ্যাসিষ্ট শক্তিপুঞ্জের প্রতি প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন সমর্থনের জন্য। অতএব রাশিয়া কেবল রাষ্ট্রসঙ্ঘের মারফৎই নহে, উহার বাহিরেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রীর সন্ধান করিল। ইহারই ফলে পশ্চিমের অন্যতম প্রধান শক্তি ফ্রান্সের সঙ্গে ১৯৩৫ সালে রাশিয়া পারস্পরিক সাহায্যদানের সামরিক মৈত্রী স্বাক্ষর করিল, যে চুক্তির অন্যতম অংশীদার ছিল চেকোশ্লোভাকিয়া এবং যাহা কুখ্যাত মিউনিক-চুক্তির সময় নূতন ইতিহাসের বিষয় হইয়াছিল। ১৯৩৫ সালে ফ্রান্স ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে মৈত্রীর পর, ১৯৩৬ সালে বহির্মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে সামরিক মৈত্রী এবং ১৯৩৭ সালে চীনের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই দুইটির উদ্দেশ্য ছিল জাপানী সাম্রাজ্যবাদের অগ্রগতিতে বাধা দেওয়া, কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ ও পশ্চিমের শক্তিবর্গের সহিত আন্তরিক সহযোগিতার দ্বারা ত্রিংশ-দশকের আন্তর্জাতিক জগতে ফ্যাসিষ্ট দৌরাত্ম্য, পররাজ্য আক্রমণ ও যুদ্ধায়োজনে রাশিয়া বাধা দিতে চাহিলেও তাহাকে কেহই অনুরূপ আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিল না। ফলে, মাঞ্চুরিয়া, চীন, আবিসিনিয়া, স্পেন, আলবানিয়া, অষ্ট্রিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়া ইত্যাদি কোন আক্রান্ত রাজ্যের ক্ষেত্রেই রাশিয়ার সমষ্টিগত নিরাপত্তার নীতি গৃহীত হইল না। বরং প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তোষণনীতির দ্বারা ফ্যাসিষ্ট শক্তিপুঞ্জকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল, যে নীতির প্রধান পাণ্ডা ছিলেন বৃটেনের চেম্বারলেন ও ফ্রান্সের দালাদিয়ের। অপরপক্ষে জার্মাণী, জাপান ও ইতালী ইঙ্গ-ফরাসী গভর্ণমেণ্টসমূহের সোভিয়েট-বিদ্বেষ ও ভীতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিল এবং হিটলার ও মুসোলিনী তারস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিলেন যে, "বলসেভিক বর্বরতা হইতে ইউরোপীয় সভ্যতাকে রক্ষা করাই" তাঁহাদের আসল লক্ষ্য। ইউরোপীয় রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সমাজে এই প্রচারকার্যের ফলও ফলিল এবং বহু দেশে ফ্যাসিষ্ট পক্ষপাতী

শক্তিসমূহ দানা বাঁধিয়া উঠিল। 'থার্ড ইণ্টারন্যাশনাল' বা 'কোমিনটার্নের' (আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট পার্টির) প্রচার ও কার্যকলাপও ধনিকতন্ত্রের বাহক রক্ষণশীল সমাজকে বহু দেশে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিল। জার্মাণী, জাপান ও ইতালী রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগ করিল তো বটেই, প্রতিপদে আন্তর্জাতিক আইন ও শৃঙ্খলা, চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে ১৯৩৬ সালের শেষভাগে কোমিনটার্ন-বিরোধী (Anti-Comintern) চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়া ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গ সোভিয়েট বিরোধিতার নীতি হাতে-কলমে প্রমাণিত করিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ইউরোপে যুদ্ধ বাধাইবার চক্রান্ত পাকা করিলেন। ইহারই পরিণতি ঘটিল ১৯৩৮ সালের চেকোশ্লোভাকিয়া সংকটে, যখন হিটলার ইউরোপে তাঁহার আর এক দফা 'শেষ ভূমিখণ্ড' দাবী করিতেছিলেন সুদেতেন প্রদেশের জার্মাণ সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার অজুহাতে। আধুনিক ইতিহাসে কুখ্যাত মিউনিক-চুক্তি ইহারই ফল। ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চেম্বারলেন ও দালাদিয়ের হিটলার ও মুসোলিনীর সঙ্গে মিউনিক সহরে একত্র হইলেন এবং এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া স্বাধীন চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্রকে হিটলারের নিকট বলি দিলেন। ইহাতে না ছিল চেকোশ্লোভাকিয়ার কোন স্বেচ্ছাদত্ত সম্মতি কিম্বা না ছিল ফ্রান্স ও চেকরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক মৈত্রীতে আবদ্ধ রাশিয়ার সঙ্গে কোন পরামর্শ। এমন কি রাশিয়াকে একবার আলোচনা বৈঠকেও ডাকা হইল না, যদিও সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, পারস্পরিক সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি অনুসারে সোভিয়েট রাশিয়া সামরিক পন্থা অবলম্বনে পর্যন্ত প্রস্তুত, অবশ্য ফ্রান্স কিম্বা চেকোশ্লোভাকিয়া যদি সম্মত থাকে। কিন্তু ফ্রান্স অগ্রসর হইল না। কোন স্বাধীন রাষ্ট্রকে "আপোষ-চুক্তির" দ্বারা এভাবে বলিদানের কলঙ্কিত দৃষ্টান্ত কদাচিৎ দেখা গিয়াছে। বিশ্বাসঘাতকতার নজীর হিসাবেও ইহা চমকপ্রদ, অথচ যাঁহারা ইহার জন্য দায়ী, তাঁহারাই সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে অনবরত গ্লানি ও কুৎসা প্রচার করিয়াছেন এবং করিতেছেন!

ইতিহাসের সততার দিক হইতে এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, সেই আন্তর্জাতিক সংকটের দিনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ফ্যাসিষ্ট শক্তিপুঞ্জের প্রতি এই প্রকার লজ্জাকর তোষণনীতি প্রকাশ্যে সমর্থন করেন নাই, বরং যুদ্ধের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে ফ্যাসিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি তীক্ষ্ণ সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, যদিও মার্কিণ ধনিকগোষ্ঠীর সোভিয়েট-বিরোধিতার সঙ্গে প্রেসিডেণ্টের এই মনোভাবের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না

বরং শাসক মহলের একাংশেও প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় সাম্রাজ্য-বাদী শক্তিবর্গের মূঢ় আত্মহত্যার নীতি মিউনিক-চুক্তির মারফৎ ইউরোপীয় যুদ্ধকে আসন্ন করিয়া তুলিল। কারণ, বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ ভাঙিগয়া গেল, সমষ্টিগত নিরাপত্তার নীতি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া গেল এবং সোভিয়েট রাশিয়া সম্পূর্ণ একক ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।' ইহার পর হিটলারের ক্ষুধার নিকট আবার "ইউরোপের শেষ ভূমিখণ্ড" পোল্যাণ্ডের মৃত্যুর দিন ঘনাইয়া আসিল। আর ১৯৩৯ সালের ১০ই মার্চ তারিখ ষ্ট্যালিন চারিঘণ্টাব্যাপী এক সুদীর্ঘ বক্তৃতায় সমগ্র পৃথিবীর গভীর এবং আসন্ন দুর্বিপাক সম্পর্কে এক ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিলেন, যাহা সেদিনের 'গণতন্ত্রবাদী' সংবাদপত্রসমূহে উল্লেখ করা পর্যন্ত হইল না! অদৃষ্টদেবী ক্রূর হাসি হাসিলেন। কারণ, শীঘ্রই আন্তর্জাতিক জগতে আর একটি মহানাটকীয় ব্যাপার ঘটিল, যাহার নাম রুশ-জার্মাণ অনাক্রমণ চুক্তি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ ভূমিকা রচিত হইল।

১৯৩৯-৪১ সালের কুজ্ঝটিকা

১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার বাকী অংশ জোর-পূর্বক দখল করিলেন এবং প্রাগে নাৎসী পতাকা উড্ডীন করিলেন। গত সেপ্টেম্বরে চেম্বারলেন ও দালাদিয়ের কর্তৃক মিউনিক-চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারা এভাবে হিটলারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ কিম্বা নাৎসীদের সেই বহুপ্রার্থীত উক্রাইনের দিকে। হিটলারের সংগে মুসোলিনী একত্র হইলেন এবং নূতন ভূমিখণ্ড ও ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য লাভের উদ্দেশ্যে কর্সিকা, টিউনিস্ ও নীস্ দাবী করিতে লাগিলেন। আর হিটলার চীৎকার করিতে লাগিলেন ডানজিগ-কোরিডোর ও পোল্যাণ্ড সম্পর্কে। ইউরোপীয় রাজনীতির এই ভয়াবহ পরিণতি ও যুদ্ধ অনিবার্য দেখিয়া বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকায় প্রবল জনমত জাগ্রত হইল। তখন বৃটিশ ও ফরাসী গভর্ণমেণ্ট জনমতের প্রাবল্য দেখিয়া বিচলিত হইলেন এবং অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার ভূমিগত অক্ষুণ্ণতা বজায় রাখিবার জন্য গ্যারেণ্টি দিলেন। অর্থাৎ হিটলারকে আর ইউরোপের কোন ভূমিখণ্ড আপোষে দেওয়া হইবে না। কিন্তু হিটলার তখন বুঝিয়াছিলেন যে, পশ্চিমের এই রক্ষণশীল শাসকবৃন্দ বেকুব, দুর্বল এবং যুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে অপটু, সুতরাং অনিচ্ছুক। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে, অর্থাৎ

ইঙ্গ-ফরাসী ও সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের মধ্যে কূটনৈতিক চুক্তির দর-কষাকষির এক সুবর্ণ সুযোগ পাইলেন। কারণ, সোভিয়েট রাশিয়া তখন পশ্চিমের রাষ্ট্রপুঞ্জ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং একক। ফলে, রাশিয়া পররাষ্ট্রীয় নীতির এক গভীর সংকটে পড়িল।

এই সময় ষ্ট্যালিন ১৯৩৯ সালের ১০ই মার্চ কমিউনিষ্ট পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতায় আন্তর্জাতিক অবস্থার গভীর বিশ্লেষণ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, ১৯২৯ সালের শেষভাগ হইতে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে যে অর্থনৈতিক সংকট সুরু হইয়াছিল, ১৯৩৩ সালের শেষভাগ পর্যন্ত তাহা অব্যাহত ছিল এবং তারপর সুরু হইল বাজার-মন্দার যুগ। ইহার পর সাময়িক-ভাবে শিল্প-বাণিজ্যে খানিকটা উন্নতি হইল বটে, কিন্তু উহা স্থায়ী হইল না এবং বহুপ্রত্যাশিত ঐশ্বর্য দেখা দিল না ...('this upward trend of industry did not develop into a boom')...বরং ১৯৩৭ সালের শেষার্ধ হইতে আবার নূতন অর্থনৈতিক সংকট আরম্ভ হইল। প্রথমে এই সংকট দেখা দিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে, তারপর বৃটেনে, ফ্রান্সে ও অন্যান্য দেশে। বেকারে ও দারিদ্র্যে বহু দেশ ছাইয়া গেল। বহু দেশের সঞ্চিত স্বর্ণভাণ্ডার (Gold reserve) ফুরাইয়া গেল—বিশেষভাবে জার্মাণী, জাপান ও ইতালীর। ষ্ট্যালিন আন্তর্জাতিক হিসাব উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন যে, ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মাণী, জাপান ও ইতালীর একত্রে যে "মজুত সোনা" ছিল, তাহা একমাত্র সুইজারল্যাণ্ডের মত ক্ষুদ্র দেশের তুলনায়ও কম। অপরপক্ষে আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্স ছিল জগতের শীর্ষদেশে। সুতরাং ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গের পক্ষে নূতন যুদ্ধায়োজনের দ্বারা কলকারখানার উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু ইহাও আত্মহত্যার পথ মাত্র। কারণ, জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন বন্ধ রাখিয়া এবং জীবনযাত্রার উন্নততর মান হইতে জনগণকে বঞ্চিত করিয়া নিতান্ত কৃত্রিম উপায়ে সামরিক উৎপাদন বাড়াইতে হইতেছে...... ("It means giving industry a one-sided, war direction—developing to the utmost the production of goods necessary for war and not for consumption by the population")…..ইহার ফলে আবার সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যেও বিভেদ সুরু হইল। কারণ, কেবল বাণিজ্যিক ও বাজারের প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা এই সংকট হইতে ত্রাণ পাওয়া যাইবে না। পৃথিবীর মানচিত্র নূতন করিয়া না আঁকিলে এবং নূতন করিয়া

ভাগ না করিলে নূতন দেশ ও উপনিবেশ পাওয়া যাইবে না....('It is no longer a question of competition in the markets of a commercial war, of dumping. These methods of struggle have long been recognised as inadequate. It is now a question of a new redivision of the world, of spheres of influence and colonies by military action.') ......"পৃথিবীকে নূতন করিয়া ভাগ করিবার" এই যুদ্ধ ইতিমধ্যেই সুরু হইয়া গিয়াছে এবং মাঞ্চুরিয়া হইতে চেকোশ্লোভাকিয়া পর্যন্ত (১৯৩১-১৯৩৮) সমস্ত ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করিয়া ষ্ট্যালিন দেখাইলেন যে, সাংহাই হইতে জিব্রাল্টার পর্যন্ত অপরিমিত ভূখণ্ডে এই নূতন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং উহার ফলে ৫০ কোটি লোক জড়াইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার মানচিত্র জোর করিয়া নূতনভাবে আঁকা হইতেছে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী সমস্ত আন্তর্জাতিক বিধি-ব্যবস্থার ভিত্তিমূল পর্যন্ত চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহারই পরিণতিতে আবার সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে "আক্রমণশীল" ও "অনাক্রমণশীল" (Aggressive and Nonaggressive) দুই রাষ্ট্রগোষ্ঠী দেখা দিয়াছে—শেষোক্ত দল (বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি) প্রথমোক্ত দলকে (জার্মাণী, জাপান ও ইতালী) কোনই বাধা দিতেছে না—নিজেদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বৈপ্লবিক সংঘাতের ভয়ে! তথাপি পৃথিবীর শান্তিরক্ষার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন ১৯৩৪ সালে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রবেশের দ্বারা নূতনভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ষ্ট্যালিন বলিলেন যে, আন্তর্জাতিক জগতের এই নিদারুণ এবং দুঃসহ অবস্থার মধ্যেও সোভিয়েট রাশিয়া (যাহার উৎপাদন ইতিমধ্যে ১৯৩৪ সালের তুলনায় ৪৭৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে!) শান্তি ও সদ্ভাব রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে এবং সোভিয়েট সরকারের পররাষ্ট্রীয় নীতির একমাত্র লক্ষ্যও ইহাই। এই নীতির ব্যাপারে ষ্ট্যালিন যাহা বলিলেন, তাহার মূল মর্ম এই—

(1) "We stand for peace and the strengthening of business relations with all countries and we shall adhere to this position...as long as they make no attempt to trespass on the interests of our country.

(2) We stand for support of nations which are victims of aggression and are fighting for the independence of their country.

(3) We are not afraid of the threats of aggressors, and are ready to deal two blows for every blow delivered by instigators of war who attempt to violate the Soviet borders."

এখানে এই বিবৃতির সম্পূর্ণটা উল্লেখ করা সম্ভব নয়। কিন্তু উহা বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যাইবে যে, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পররাষ্ট্রীয় নীতিতে কেবল শান্তি ও আত্মরক্ষাই সন্ধান করেন নাই, আক্রান্ত দেশগুলিকে রক্ষার এবং জনগণের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করিবার জন্য আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেও প্রস্তুত ছিলেন—চীন হইতে চেকোশ্লোভাকিয়া পর্যন্ত এবং নিজের দেশ সম্পর্কে ত' কথাই নাই! নূতন পররাষ্ট্র-সচিব মঃ মলোটভ ৩১শে মে তারিখ সোভিয়েট পার্লামেণ্টের এক বক্তৃতায় মঃ ষ্ট্যালিনের বিবৃতিরই পুনরাবৃত্তি করিয়া আক্রমণ-নিরোধের সংকল্প পুনরায় ব্যক্ত করেন। কিন্তু পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের জন্য এই সমস্ত নীতি ব্যর্থ হইয়া গেল, যেমন ব্যর্থ হইল সমষ্টিগত নিরাপত্তা-বিধানের দাবী। তথাপি এই সংকটের মধ্যেও এবং হিটলার কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণের নূতন আয়োজন সত্ত্বেও বৃটিশ ও ফরাসী গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন না। অথচ ইংলণ্ডের উদারতাপন্থী রাজনীতিকগণ, এমন কি চার্চিল ও লয়েড জর্জ পর্যন্ত বলিলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত সামরিক মৈত্রী না করিয়া পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়া সম্পর্কে গ্যারাণ্টি দেওয়া 'রণনৈতিক আত্মহত্যার' সমান হইবে এবং জনমতও এই দাবী জানাইতে লাগিল। তখন এই দাবীকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে এক প্রকাণ্ড ধাপ্পা দেওয়া হইল—১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাস হইতে চারিমাস কাল রাশিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপনের জন্য আলোচনার নাম করিয়া দিনের পর দিন কাল-হরণের কৌশল অনুসরণ করা হইল। উভয় পক্ষেরই এই সময়কার কূটনৈতিক ইতিহাস জটিল। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, ফ্রান্স ও বৃটেন চাহিল রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনার নাম করিয়া হিটলারের নিকট হইতে অধিকতর সুবিধা আদায় এবং হিটলারী নূতন আক্রমণের গতি পূর্বদিকে প্রবাহিত করা। আর জার্মাণী চাহিল একই সময়ে দুই রণাঙ্গনের দায়িত্ব পরিহারের জন্য পূর্ব বা পশ্চিমের মধ্যে যে-কোন এক পক্ষকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় ও বিচ্ছিন্ন করিতে এবং রাশিয়া চাহিল ইউ-রোপীয় শান্তিরক্ষা ও মহাযুদ্ধের ফ্যাসাদ হইতে ত্রাণলাভের জন্য দুই-এর মধ্যে অধিকতর নিরাপত্তার নীতি (এবং তাহা যত সাময়িকই হউক) অনুসরণ করিতে। এপ্রিল মাস হইতে এই বিচিত্র এবং অভিনব কূটনৈতিক আলোচনার পর 'গ্রীষ্ম-কালের সংকট' (যাহা ইউরোপে 'August crisis' নামে পরিচিত) আসিয়া

পড়িল এবং হিটলারী আক্রমণ প্রত্যাসন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইল। বৃটেন ও ফ্রান্সের সংগে সোভিয়েট রাশিয়ার আলোচনা রাশিয়ার পার্শ্ববর্তী দেশগুলির নির্বিঘ্নতা বিধানের প্রশ্নে এবং পোল্যান্ড ও রুমানিয়া কর্তৃক রাশিয়ার সামরিক সাহায্যদানের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবার ফলে ভাঙ্গিয়া গেল। তখন বার্লিন ও মস্কোর মধ্যে ইতিমধ্যে যে 'আলোচনা চলিতেছিল, সেই অনুসারে হিটলার ও ষ্ট্যালিন পরস্পর কূটনৈতিক করমর্দন করিলেন। অসম্ভবও সম্ভব হইল এবং ১৯৩৯ সালের ২৩শে আগষ্ট তারিখ নাৎসী জার্মাণী ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল, যাহার মেয়াদ ছিল ১০ বৎসর।

সেদিনের পৃথিবী "ফ্যাসিষ্ট কমিউনিষ্ট" অনাক্রমণ চুক্তির সংবাদে স্তম্ভিত হইয়াছিল এবং ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক জগতে এক গভীর কুজ্ঝটিকার যুগ দেখা দিল—যখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে গ্লানি প্রচারের কোন ইয়ত্তা ছিল না। এই সম্পর্কে এখানে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। কারণ, এই চুক্তির সংগে রাজনৈতিক মতামতের ও আদর্শের কোন সম্পর্ক ছিল না। যদি থাকিত, তবে ১৯৩৩ সালে মুসোলিনীর ইতালীর সংগে অনাক্রমণ চুক্তির স্বাক্ষর কিভাবে সম্ভব ছিল? সুতরাং ইহার মূলকথা ছিল আত্মরক্ষা, যাহা নিরপেক্ষ বিচারে যুক্তিসম্মত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এই সম্পর্কে আমরা একটি মাত্র মতামত উদ্ধৃত করিতেছি। কারণ, এই মতামত ধ্বনিত হইয়াছে কমিউনিষ্ট-বিরোধী মহল হইতে। মস্কোস্থিত মার্কিণ রাষ্ট্রদূত জোসেফ ডেভিস্ ১৯৪১ সালের ১৮ই জুলাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের উপদেষ্টা হ্যারি হপকিন্সের নিকট যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই—

"১৯৩৬ সাল হইতে আমি যাহা কিছু দেখিয়াছি এবং যতটুকু ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছি, তাহাতে আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেন্ট এবং উহার প্রেসিডেন্টের পর পৃথিবীতে একমাত্র সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট ছাড়া আর কেহই শান্তির ব্যাপারে হিটলারী বিপদ সম্পর্কে এত সচেতন ছিলেন না এবং অনাক্রমণকারী শক্তিবর্গের মধ্যে সমষ্টিগত নিরাপত্তা ও মৈত্রীস্থাপনের প্রয়োজনীয়তাও তাঁহাদের মত আর কেহই এতটা স্পষ্ট অনুভব করেন নাই। তাঁহারা চেকোশ্লোভাকিয়ার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং এজন্য মিউনিক-চুক্তির আগেই পোল্যান্ডের সংগে অনাক্রমণ চুক্তি বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন। কেননা, সন্ধিসর্ত অনুযায়ী চেকোশ্লোভাকিয়া রক্ষার্থ অগ্রসর হইতে

হইলে পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া সৈন্য পাঠাইবার জন্য রাস্তা খোলা রাখা দরকার।......মিউনিকের পরেও ১৯৩৯ সালের সারা বসন্তকাল তাঁহারা বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে সামরিক চুক্তির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার আপত্তি এবং বৃটেন কর্তৃক রাশিয়াকে গ্যারাণ্টি দানের অস্বীকৃতির জন্য ইহা সম্ভব হয় নাই। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট উপলব্ধি করিলেন (এবং এই উপলব্ধির মূলে যথেষ্ট যুক্তি আছে) যে, ফ্রান্স ও বৃটেনের সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ, কার্যকরী এবং বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বন সম্ভব নহে। সুতরাং তাঁহারা হিটলারের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হইলেন।" ('Mission To Moscow' গ্রন্থের ৪৩৪—৪৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১৯৩৯ সালের রুশ-জার্মাণ অনাক্রমণ চুক্তির এই কুজ্ঝটিকা আজ ইতিহাসের নূতন আলোকে অনেকাংশে দূর হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেদিন ১৯৪১ সালের জুন মাস পর্যন্ত, অর্থাৎ হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণ না করা পর্যন্ত ইহা বাড়িয়াই চলিল। কারণ, ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরের শেষে পূর্ব পোল্যাণ্ড (যাহা এককালে রাশিয়ারই দেশ ছিল) রাশিয়ার দখলে গেল এবং ১৯৩৯—৪০ সালের শীতকালে আবার ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ হইল। তারপর ১৯৩৯ সালে যে তিনটি বাল্টিক রাজ্য (লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া, এস্থোনিয়া) সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক মৈত্রীতে আবদ্ধ ছিল, সেগুলি ১৯৪০ সালে রাশিয়ার সহিত যুক্ত হইল এবং রুমানিয়ার বেসারাবিয়া প্রদেশও সোভিয়েট সীমানার অন্তর্গত হইল। ইহার প্রত্যেকটি ঘটনাই গিয়াছে জার্মাণীর সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে সীমানা সুরক্ষিত করিবার জন্য। কিম্বা এক কথায় বিশুদ্ধ সামরিক প্রয়োজনে—যেমন লেনিনগ্রাডের আত্মরক্ষার জন্য পূর্বাহ্ণে বাল্টিক সমুদ্রের কয়েকটি দ্বীপ ও ফিনল্যাণ্ডের ক্যারেলিয়া অঞ্চল দখলে আনিতে হইয়াছিল শান্তি-সন্ধির দ্বারা। আরও মনে রাখা দরকার, ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে হিটলারী জার্মাণীর গোপন সামরিক চক্রান্ত ছিল এবং তাহারই ফলে ফিনল্যাণ্ড ১৯৪১ সালে পুনরায় অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। কিন্তু এই ঘটনার জন্য সোভিয়েট পররাষ্ট্রীয় নীতির বিরুদ্ধে নিন্দুকের রসনা মুখর হইয়া উঠিল এবং একদল লোক এমনও প্রচার করিলেন যে, আসলে রাশিয়া হিটলারী সৈন্যবাহিনীর ভয়ে স্নায়বিক দুর্বলতায় আক্রান্ত হইয়াছে এবং এজন্যই আত্মরক্ষার নামে উৎকট আচরণ করিতেছে। তখন ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ স্বনামধন্য বার্ণার্ড শ' তাঁহার অনুপম ভাষায় এই তীক্ষ্ম মন্তব্য করিলেন যে, যদি হিটলার ও জার্মাণ বাহিনীর ভয় রাশিয়ার থাকিত, তাহা হইলে রাশিয়া প্রত্যেকটি সামরিক সঙ্কটে হিটলারের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করিয়া চলিল কিরূপে এবং

কিরূপেই বা হোয়াইট রাশিয়া (পোল্যাণ্ডের পূর্বাংশ) রুশ-ফিনিস সীমান্ত বা বাল্টিক রাজ্যগুলি নিজেদের সীমানার মধ্যে আনিল? হিটলার কি এই ব্যাপারে সুখী ছিলেন কিম্বা তিনি লালফৌজকে ঘাঁটাইলে কি প্রতিরুদ্ধ হইতেন না?

অতঃপর বার্ণার্ড শ' মন্তব্য করিলেন যে, সমাজতন্ত্রবাদের শত্রু হইতেছে যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধকে পরিহার করাই ষ্ট্যালিনের লক্ষ্য ছিলঃ—

"Obviously, what Stalin is afraid of is not military defeat but war as such. In a socialised country war is a nuisance and a mischief to everybody. To turn from the marvellous welfare work of building a new civilisation in Asiatic Russia and bringing European Russia up to date to pure destructions, mischief and devilment, is worst that Stalin has to fear, and naturally he will go to the utmost limit of prudence to avoid it."

একদিকে যুদ্ধ এড়াইয়া চলা এবং অন্যদিকে সামরিক আত্মরক্ষার আয়োজন যতদূর সম্ভব নিরঙ্কুশ করা, ইহাই ছিল ১৯৩৯—৪১ সালের ইউরোপীয় যুদ্ধের দিনে রাশিয়ার একান্ত লক্ষ্য। কারণ, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট জানিতেন যে, হিটলারী আঘাত তাঁহাদের উপর পড়িবেই। সুতরাং ইতিমধ্যে যতটা সম্ভব প্রস্তুত হওয়ারও প্রয়োজন ছিল। যদি একমাত্র মতবাদের খাতিরে এবং বিভিন্ন মহলের নিন্দার ভয়ে রাশিয়া তখন হাত গুটাইয়া থাকিত, তবে, অমিতবিক্রম জার্মাণ বাহিনীর সামগ্রিক আক্রমণে রাশিয়া কি আরও গভীরতর বিপাকে পড়িত না? এ কারণেই রাশিয়া তাহার পার্শ্ববর্তী ফিনল্যাণ্ড, বাল্টিক রাজ্য ও বলকান রাজ্যগুলির সঙ্গে একান্ত সামরিক মৈত্রীর চেষ্টা করিয়াছিল এবং তিনটি বাল্টিক রাজ্যের সঙ্গে উহা স্বাক্ষরও করিয়াছিল। ১৯৩৯ সালের অক্টোবরে এজন্য দার্দানেলিস প্রণালী ও কৃষ্ণসাগরের পথ নির্বিঘ্ন করিবার জন্য তুরস্কের সঙ্গে একটি সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তুরস্ক উহাতে রাজী ছিল না। তারপর, ১৯২৫ সাল হইতে সোভিয়েট সাইবেরিয়ার সীমান্ত রক্ষার জন্য যে জাপানের সঙ্গে রাশিয়া বারবার অনাক্রমণ চুক্তির প্রস্তাব করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিল (১৯৩৮—৩৯ সালে জাপান এই অঞ্চলে সীমান্ত সংঘর্ষেও লিপ্ত হইয়াছিল), অবশেষে ১৯৪১ সালের ১৩ই এপ্রিল তাহা স্বাক্ষরিত হইল। জাপানের সঙ্গে ১৯৪১ সালের এই চুক্তি-স্বাক্ষর সেদিনের ইতিহাসে কম উল্লেখযোগ্য ছিল না, যদিও ইহার গুরুত্ব সেদিন অনেকেই বুঝিতে পারেন নাই।

রাশিয়ার শান্তিনীতি সম্পর্কে যদি আরও কোন প্রমাণের দরকার হয়, তবে, খোদ চার্চিলের মতামতও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ইউরোপে সোভিয়েট সাম্যবাদের এতবড় বিরোধী বোধ হয় আর কেহই নাই, তবু সেই চার্চিল সাহেব পর্যন্ত ১৯৩৯ সালের সংকটের দিনে একটি পত্রিকায় ('Picture Post', ১১ই মার্চ) লিখিলেন—

'Soviet Russia has never made the blunder of thinking that the welfare of its people could be increased by looting its neighbours. However much one may disagree with its political and economic theories, it has hitherto shown no trace of the aggressive intentions which appear to inform the three partners of the so-called axis. If Russia were prepared to cooperate...I would welcome her assistance in maintaining the peace of the world."

'প্রতিবেশীদের সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশের জনগণের কল্যাণ করা যায়, এতবড় ভুল সোভিয়েট রাশিয়া কোনদিন করে নাই। উহার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের সংগে অপরের যে বিরোধই থাকুক না কেন, পররাজ্য আক্রমণের কোন প্রকার ইচ্ছা আজ পর্যন্ত সে দেখায় নাই—যে ইচ্ছা অক্ষশক্তিবর্গের (জার্মাণী, জাপান ও ইতালী) মধ্যে প্রকাশমান। অতএব পৃথিবীর শান্তিরক্ষার জন্য রাশিয়ার সহযোগিতাকে সাদর সম্বর্ধনা জানানো যাইতে পারে'—মিঃ চার্চিলের ছিল ইহাই অভিমত। কিন্তু এই সমস্ত মতামত তুচ্ছ করিয়াই সেদিনের ইউরোপীয় শাসকমণ্ডলী হিটলারী মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, যাহার ফলে বিচ্ছিন্ন রাশিয়া জার্মাণীর সহিত অনাক্রমণ চুক্তি-স্বাক্ষরে বাধ্য হইয়াছিল।

তথাপি ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪১ সালের জুন মাস পর্যন্ত রাশিয়ার রাজনৈতিক কার্যকলাপ বিভিন্ন দেশে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল, উহার মূলে দুইটি বড় কারণ রহিয়াছে, যাহা উল্লেখ না করিলে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হইবে না। প্রথমতঃ রুশ-জার্মাণ চুক্তির প্রতি 'আক্ষরিক' সম্মান দেখাইতে গিয়া ১৯৩৯—৪১ সালে সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ ও পত্রিকাসমূহ এমন ধরণের মন্তব্য ও বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, যাহা পড়িলে স্বতঃই মনে হয় যে, এই যুদ্ধের জন্য হিটলারী জার্মাণীর মোটেই দোষ ছিল না, যত দোষ বৃটিশ সরকার ও ফরাসী গভর্ণমেণ্টের এবং সেই সময়কার জার্মাণ যুদ্ধ ও আক্রমণগুলি রাশিয়া যেন সমর্থন করিয়া যাইতেছে! দ্বিতীয়তঃ ফ্রান্স, বৃটেন, আমেরিকা ও ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট

পার্টিসমূহ 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের' তীব্র নিন্দাবাদে গগন মুখরিত করিয়া এমন ভঙ্গী দেখাইতে লাগিল যে, রুশ-জার্মাণ অনাক্রমণ চুক্তিই যেন এই যুদ্ধের শেষকথা ছিল এবং ফ্যাসিষ্ট ও কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যে কোন নীতি, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী-সঞ্জাত যেন গুরুতর বৈষম্য ছিল না! সোভিয়েট পররাষ্ট্রীয় নীতির ভুল ব্যাখ্যা এবং আন্তর্জাতিক জগতের পরিবর্তিত অবস্থা সম্পর্কে নিতান্ত ভুল ধারণার জন্যই বিভিন্ন কমিউনিষ্ট পার্টি এই বিচিত্র কুজ্ঝটিকার মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। অন্যথা এই সহজ কথাটি তাহাদের ভোলা উচিত ছিল না যে, হিটলার ও ফ্যাসিষ্ট দলের মত সমাজতন্ত্রবাদের এতবড় শত্রু ইউরোপে আর জন্মায় নাই। অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, রুশ-জার্মাণ অনাক্রমণ চুক্তিতে বাল্টিক রাজ্য, পোল্যান্ড এবং রুমানিয়া সম্পর্কে পারস্পরিক 'প্রভাবান্বিত এলাকা' বিষয়ে গোপন সম্মতি ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মহামৈত্রী

১৯৪১ সালের ২২শে জুন ভোররাত্রে রুশ-জার্মাণ অনাক্রমণ চুক্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হিটলার সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করিলেন। সেদিন হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চেহারা ও চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। চেহারার পরিবর্তন ঘটিল কেবল এই ক্রূর মহাযুদ্ধের বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতির জন্যই (ডিসেম্বর মাসে জাপান এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরে সংগ্রাম সুরু করিল) নহে, কেবল রণনীতি ও রণকৌশলের বিজ্ঞানসিদ্ধ আসুরিক দ্বন্দ্বের জন্যই নহে, চেহারার পরিবর্তন ঘটিল সর্বাত্মক আক্রমণকে সর্বাত্মক প্রতিরোধের দ্বারা, যাহা ইউরোপের বাকী অংশে এতদিন সম্ভব হয় নাই। আর চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিল উহার অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক আবর্তের জন্য—বাহ্যিক সাম্রাজ্যবাদীয় দ্বন্দ্ব হইতে উহা ফ্যাসিজম বনাম গণতন্ত্র কিম্বা ফ্যাসিষ্ট ও ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী সংগ্রামে রূপান্তরিত হইল—'জন-যুদ্ধের' অপ্রতিহত শক্তি বিজিত দেশগুলিতে পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। শান্তির দিনে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি রাশিয়ার সহিত হাত মিলাইতে পারেন নাই, আজ মহাযুদ্ধের রক্তপ্লাবনের মধ্যে তাঁহারাই পরস্পরের বন্ধুতা অঙ্গীকার করিলেন। কারণ 'common enemy' রূপে ফ্যাসিজম গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, উভয়ের ক্ষমাহীন শত্রুরূপে দেখা দিল। সুতরাং রাজনীতি ও রণনীতি, উভয়ের পরিবর্তন ঘটিল।

হিটলারী আক্রমণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল পার্লামেণ্টে এক ইতিহাসখ্যাত বক্তৃতায় সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি বন্ধুতা ও সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিলেন, যাহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রাজনৈতিক রূপান্তর ঘোষণা করিল। অতলান্তিকের ওপার হইতে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট আক্রান্ত রাশিয়ার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। জার্মাণী, ইতালী ও জাপান কিম্বা অক্ষশক্তিবর্গের দুনিয়াব্যাপী দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে বৃটেন, আমেরিকা ও রাশিয়া মিত্রশক্তিরূপে পরিগণিত হইলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মহামৈত্রী স্বাক্ষরিত হইল এবং দুনিয়াব্যাপী নিদারুণ দুর্দিন, বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার এবং বর্বরতাপ্রসূত অন্ধকারের মধ্যে লাঞ্ছিত মানুষ যুদ্ধোত্তর যুগের নূতন স্বর্ণময় দিনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। মহাযুদ্ধের মিত্রগণ বার বার মানুষের শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সুমহৎ প্রতিশ্রুতি দিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন ও মাসের পর মাস যুদ্ধের অগ্রগতির পথে বৃটেন, আমেরিকা ও রাশিয়া পরস্পরের ঘনিষ্ঠতর সংস্পর্শে ও সহযোগিতার সর্তে আবদ্ধ হইলেন এবং চার্চিল, রুজভেল্ট ও ষ্ট্যালিন মহাযুদ্ধের মহানায়করূপে ব্যক্তিগত বন্ধুতার মানবীয় সম্পর্কের মধ্যে উদ্বুদ্ধ হইলেন। বহু জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়া তাঁহাদের পারস্পরিক সৌভ্রাত্র ও প্রতিভার স্বীকৃতি ঘটিতে লাগিল। মহাযুদ্ধ যেন অঘটন ঘটাইল!

সুরু হইল নূতন মৈত্রী ও চুক্তি-স্বাক্ষরের যুগ। ১৯৩৯ সালের সংকটে বৃটেনের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের যে ছেদ ঘটিয়াছিল, তাহা আবার জোড়া লাগিতে লাগিল মস্কোতে বৃটিশ রাজদূতরূপে স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপসের নিয়োগে এবং জার্মাণ আক্রমণের পর ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে মস্কোতে একটি ইঙ্গ-রুশ সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ১৯৪২ সালের মে মাসে এই চুক্তিরই সূত্র ধরিয়া বৃটেন ও রাশিয়ার মধ্যে পূর্ণ সামরিক মৈত্রী স্বাক্ষরিত হইল এবং ইহার মেয়াদ হইল ২০ বৎসর, যাহা আজও বলবৎ আছে। ১৯৪২ সালের জুন মাসে সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধের পারস্পারিক সহযোগিতা সম্পর্কে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে মস্কোতে প্রধান ত্রিশক্তির—বৃটেন, আমেরিকা ও রাশিয়ার পররাষ্ট্র-সচিবগণ মিলিত হইলেন এবং ইউরোপে জার্মাণীর ফ্যাসিস্ট তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলি, যেমন অষ্ট্রিয়া ও ইতালী সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। জার্মাণ নাৎসী নেতাদের বিবিধ অত্যাচারের প্রশ্ন সম্পর্কেও শাস্তিদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। ইহার আগে ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী পৃথিবীর ৩২টি রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে

যুদ্ধজয় ও শত্রুপক্ষের বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের দাবীতে মিত্রপক্ষের সংকল্প জানাইয়া এক ঘোষণা দেওয়া হইল। মস্কোর পর ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে রুজভেল্ট, ষ্ট্যালিন, চার্চিলের্ তেহরাণ সহরে (ইরাণের রাজধানী) প্রথম যে ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক বৈঠকের অনুষ্ঠান হইল, তাহাতে স্থির হইল যে, মিত্রশক্তিবর্গ ইউরোপের যে সমস্ত রাজ্য নাৎসী কবল হইতে উদ্ধার করিবেন, সেগুলির তত্ত্বাবধান, ফ্যাসিজমের উচ্ছেদ ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন শক্তির মধ্যে বিভিন্ন এলাকা হিসাবে শাসিত হইবে। সেই অনুসারে পূর্ব ইউরোপ ও জার্মাণীর এক বৃহৎ অংশ সোভিয়েট তত্ত্বাবধানে থাকিবে। তারপর জার্মাণীর পরাজয়ের পূর্বাহ্নে ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ক্রিমিয়ার ইয়াল্টা সহরে রুজভেল্ট, ষ্ট্যালিন ও চার্চিলের মধ্যে আর একটি ঐতিহাসিক বৈঠক হইল এবং বিজিত জার্মাণী, ইউরোপ ও পৃথিবীর শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ বা ইউ-এন-ও সম্পর্কে একটি যুগান্তকারী ঘোষণা প্রচারিত হইল। আধুনিককালে ইহাই ইয়াল্টা চুক্তি নামে খ্যাত। ৮ই মে, ১৯৪৫, জার্মাণী আত্মসমর্পণ করিল এবং বৃটেন, আমেরিকা ও রাশিয়ার তিন রাষ্ট্রপ্রধানের শেষ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বৈঠক অনুষ্ঠিত হইল বার্লিনের অদূরবর্তী পটসডাম সহরে —১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে। তখন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট পরলোকে এবং বৃটেনের নূতন নির্বাচনের ফলে চার্চিল প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত। ট্রুম্যান, ষ্ট্যালিন ও এটলি ইউরোপ, জার্মাণী ও জাপান সম্পর্কে আর একটি যুগান্তকারী ঘোষণা প্রচার করিলেন। এই বৈঠকে জাপানের বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের দাবী করা হইল। জাপানের উপর এ্যাটম্ বোমা নিক্ষেপের সিদ্ধান্তও গৃহীত হইল গোপনে ট্রুম্যান ও চার্চিলের আলোচনার ফলে (এটলির সংগে চার্চিলও বৈঠকে যোগ দিয়াছিলেন)। বিজিত জার্মাণীর ভবিষ্যৎ রজানৈতিক, অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বিলি-ব্যবস্থার মূল নীতি ও পদ্ধতিগুলিও পটসডামে স্থিরীকৃত হইল এবং এই পটসডাম চুক্তিই যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর এক বৃহৎ ইতিহাসের ভিত্তিতে পরিণত হইয়াছে। ইয়াল্টা বা ক্রিমিয়া বৈঠকে রুজভেল্টের নিকট ষ্ট্যালিন প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, জার্মাণীর পরাজয়ের পর তিন মাসের মধ্যে রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। সেই অনুসারে ১৯৪৫ সালের ৮ই আগষ্ট সোভিয়েট রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল এবং মাঞ্চুরিয়াতে প্রকাণ্ড ব্যাপক অভিযান চালাইল। ৬ই এবং ৯ই আগষ্ট হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে এ্যাটম বোমা নিক্ষিপ্ত হইল এবং ১৪ই আগষ্ট তারিখে জাপ-সম্রাট হিরোহিতো জাপানের পরাজয় ও আত্মসমর্পণের স্বীকৃতি জানাইয়া এক বেতার ঘোষণা প্রচার করিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হইল।......

উপরের কথাগুলি পাঠকবর্গ এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিলেন বটে, কিন্তু এই মহাযুদ্ধের ইতিহাস বহুসংখ্যক "মহাভারতকে" পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইতিহাসের এই বিরাট হিমালয় পর্বত ডিঙ্গাইতে গিয়া আমরা সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতির কোন্ কোন্ গিরিচূড়ার পরিচয় পাই? নিঃসন্দেহে রাশিয়ার এই যুদ্ধ একান্তরূপে আত্মরক্ষার সংগ্রামে পরিণত হইয়াছিল, যাহার নাম ছিল 'স্বাদেশিকতার সংগ্রাম' বা 'patriotic war, সুতরাং ইহার আশু এবং প্রথম লক্ষ্য ছিল নাৎসী আক্রমণ হইতে 'পিতৃভূমির' উদ্ধার। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য সমগ্র সোভিয়েট সমাজ রক্তের অক্ষরে স্বদেশোদ্ধারের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিল। কিন্তু এই লক্ষ্য কেবল স্বদেশের জন্যই নহে, সমগ্র ইউরোপ এবং পৃথিবীর ফ্যাসিষ্ট-উৎপীড়িত জাতিগুলির প্রতিও প্রসারিত হইল। ইহার জন্য প্রয়োজন হইল বৃটেন, আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা ও ঘনিষ্ঠতর মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা, যাহা মস্কোর পররাষ্ট্র-সচিবদের বৈঠক হইতে পটসডাম চুক্তি পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। রাশিয়া এই প্রতেক্যটি বৈঠকে আন্তরিক সহযোগিতার পরিচয় দিয়াছে এবং প্রত্যেকটি চুক্তিপত্র যথাসাধ্য সততার সহিত পালনের জন্য চেষ্টা করিয়াছে। কেবল যুদ্ধক্ষত দেশ ও জাতিসমূহের মুক্তিবিধানই এই মহাসংগ্রামের আশু লক্ষ্য ছিল না, ভবিষ্যৎ শান্তি ও নির্বিঘ্নতা বিধানের দিকেও রাশিয়ার একান্ত নজর ছিল। যুদ্ধেব গতিপথে রাজনৈতিক দিক পরিবর্তনের যে সূচনা হইয়াছে, সে কথা স্বীকার করিয়া ১৯৪২ সালের ৬ই নভেম্বর ষ্ট্যালিন এক বক্তৃতায় বলিলেন যে, হিটলারী আক্রমণের ফলে পৃথিবী দ্বিধাবিভক্ত কিম্বা দুইটি রাজনৈতিক তাঁবুতে পরিণত হইয়াছে—একটি শিবিরে রহিয়াছে ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গ এবং অন্য শিবিরে ইঙ্গ-মার্কিণ-সোভিয়েট পক্ষ। এই দুই শিবিরের দুই প্রকার কর্মতালিকা রহিয়াছে—ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গের উদ্দেশ্য হইতেছে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে পদানত করা এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ধ্বংস করা। কিন্তু অপর পক্ষের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পৃথক এবং তাহা হইতেছে—

"The program of action of the Anglo-Soviet-American coalition is : abolition of racial exclusiveness; equality of nations and inviolability of their territories; liberation of the enslaved nations and the restoration of their soverign rights; the right of every nation to manage its affairs in its own way; economic aid to nations that have suffered...restoration of mdeocratic liberties..."

কিন্তু বৃটেন ও আমেরিকার সংগে সোভিয়েট রাশিয়ার যে মূল আদর্শ ও নীতির বৈষম্য রহিয়াছে, তাহা দ্বারা এই মহামৈত্রীর কোন ব্যাঘাত হইবে না তো? —এই প্রশ্ন ১৯৪২ সালেই দেখা দিয়াছিল, যাহার জন্য যুদ্ধ ব্যাহত হইবে বলিয়া অনেকে আশংকা করিতেছিলেন। সুতরাং নভেম্বর মাসের সেই বক্তৃতাতেই ষ্ট্যালিন জবাব দেন—

'It would be ridiculous to deny the difference in the ideologies and social systems of the various countries that constitute the Anglo-Soviet-American coalition. But does this preclude the possibility, and the expediency, of joint action on the part of the members of this coalition against the common enemy who threatens to enslave them ? Certainly not more than that. The very existence of this threat imperatively dictates the necessity of joint action among the members of the coalition in order to save mankind from reversion to savagery and mediaeval brutality...' ('On the great Patriotic War of the Soviet Union'— ষ্ট্যালিনের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

ইংগ-সোভিয়েট-মার্কিণ মৈত্রী রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শগত বৈষম্য সত্ত্বেও একত্রে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে পারিবে, এই বিশ্বাস ষ্ট্যালিনের ছিল। কেননা, তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, মনুষ্য জাতিকে বর্বরতা হইতে উদ্ধার করিবার যে জরুরী প্রয়োজন আছে, সেই প্রয়োজনের তাগিদেই সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ পরিচালনার প্রয়োজন। মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ষ্ট্যালিন তেহরাণ-ইয়াল্টা-পট্সডাম বৈঠকে ইংগ-মার্কিণ রাষ্ট্রনেতাদের সংগে সর্বাধিক মত-সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। তিনি বার বার ইউরোপের পরাধীন জাতিসমূহের মুক্তি, স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য প্রকাশ্য বক্তৃতায় দাবী জানাইয়াছিলেন। পাছে রাশিয়ার যুদ্ধজনিত ভয়াবহ সংকটের দিনে দ্বিতীয় রণাংগন সৃষ্টির দাবী লইয়া নিজেদের দেশের জনগণের মধ্যেও মিত্ররাষ্ট্রপুঞ্জের বিরুদ্ধে কোন অসন্তোষ দেখা দেয়, সেজন্য তিনি ১৯৪২এর নভেম্বরের বক্তৃতায়ই সতর্কতা অবলম্বন করিলেন এবং বলিলেন—

"It is often asked : But will there be a second front in Europe after all ? Yes, there will be ; sooner or later, there will be. And there will be one not only because we need it, but above all because our Allies need it no less than we..."(পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক)

মিত্ররাষ্ট্রপুঞ্জ সম্পর্কে এই আশা ষ্ট্যালিন, তথা সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট পোষণ করিয়াছিলেন কেবল প্রচারকার্যের জন্য নহে, বাস্তব প্রয়োজনের খাতিরে এবং প্রয়োজনের দিকে চাহিয়াই তিনি আর একটি চাঞ্চল্যকর পন্থা অবলম্বন করিলেন, যাহাও কম যুগান্তকারী ছিল না। পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক শক্তিবর্গ হিটলারী জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে গিয়াও পাছে 'আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের' ভয়ে সোভিয়েট সহযোগিতার প্রতি কোনপ্রকার সন্দেহ এবং অবিশ্বাস পোষণ করে, এজন্য ১৯৪৩ সালের ২১শে মে মস্কো হইতে কোমিণ্টার্ণ (থার্ড ইণ্টার-ন্যাশনাল) বা আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংঘকে ভাঙিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইল এবং প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় জনসাধারণকে রাজনৈতিক ও ধর্মমত নির্বিশেষে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় সহযোগিতা করিবার জন্য আহ্বান জানানো হইল। 'রয়টারের' জনৈক প্রতিনিধি মঃ ষ্ট্যালিনকে এই সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, "The dissolution of the Communist International is proper because : it exposses the lie of the Hitlerites to the effect that 'Moscow' allegedly intends to intervene in the life of other nations and to 'bolshevize' them. And end is now being put to this lie.".

রাশিয়া কর্তৃক অপর দেশের স্কন্ধে জোরপূর্বক সাম্যবাদ চাপাইয়া দেওয়ার আশঙ্কা আজও আছে (এই বিষয়ে পরে একটি পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে) এবং সেদিনও ছিল। মস্কো কর্তৃক বিশ্ব-বিপ্লব অনুষ্ঠানের সেই সন্দেহ ও অবিশ্বাস হইতে মিত্রশক্তিবর্গকে মুক্তি দিয়া মহাযুদ্ধে পূর্ণতর মৈত্রীর আর একটি চাঞ্চল্যকর প্রমাণ দেওয়া হইল। অর্থাৎ মিত্রপক্ষের সহিত সহযোগিতার পথে কোন বড় রকমের বিঘ্ন দেখা দিতে পারে, ষ্ট্যালিন এবং সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট তেমন সম্ভাবনা যথাসাধ্য নষ্ট করিতে চাহিলেন।

মহাযুদ্ধের মৈত্রীর খেসারৎ

মহাযুদ্ধের এই পারস্পরিক সহযোগিতা 'grand alliance' বা মহামৈত্রী নামে পরিচিত ছিল এবং এই মৈত্রী রক্ষার জন্য সোভিয়েট রাশিয়া ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে জাপানের আত্মসমর্পণ পর্যন্ত বহু প্রকারে চেষ্টা করিল। সেই চেষ্টারই ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যাইবে বিভিন্ন চুক্তিতে এবং প্রধান শক্তিপুঞ্জের বৈঠকে। 'কোমিণ্টার্ণ' বা তৃতীয় আন্তর্জাতিক ভাঙিয়া

দেওয়ার মধ্যেও সেই একই চেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কিন্তু এত করিয়াও রাশিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষের এক শ্রেণীর সোভিয়েট-বিদ্বেষীদের মন হইতে অবিশ্বাস ও ভীতি সম্পূর্ণ দূর করিতে পারিল না। বরং তাঁহাদের মনে মনে আশা ছিল যে, ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালের ভয়াবহ জার্মাণ অভিযানে রাশিয়া পরাজিত ও ধ্বংস হইবে এবং এভাবে 'কমিউনিজমের উৎপাত' দূর হইয়া যাইবে, তারপর ইঙ্গ-মার্কিণের হাতে জার্মাণীরও পরাজয় হইবে এবং শেষ পর্যন্ত রক্ষণশীল ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠীর রাজত্ব দুনিয়ায় কায়েম হইবে। ইহারই জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতিপথে কেবল দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রশ্নেই নহে, ইহার সুরুতেই ১৯৩৯-৪০ সালের ফিনল্যাণ্ড যুদ্ধের সময়েও রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী কর্তৃপক্ষ খড়্গহস্ত ছিলেন। পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধায়োজনের বদলে (যাহার অভাবে পশ্চিম ইউরোপ কয়েক দিনের মধ্যেই হিটলারী আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া গেল) তাঁহারা ফিনল্যাণ্ডের ভিতর দিয়া এবং দক্ষিণ ককেশাসের বাকু-বাটুম অঞ্চল দিয়া রাশিয়াকে আক্রমণের জন্য পরিকল্পনা ও চক্রান্ত করিতেছিলেন। এই চক্রান্তের গোপনীয় দলীল ও চিঠিপত্র তদানীন্তন ফরাসী সেনাপতি জেনারেল গামেলাঁ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন (প্রথম প্রবন্ধে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে)। এই চক্রান্তের অন্যতম পাণ্ডা ছিলেন জেনারেল ওয়েগাঁ এবং ফিনল্যাণ্ডের জেনারেল ম্যানারহাইম। তাঁহারা একত্রে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানের চিন্তা ও চেষ্টা করিতেছিলেন। এদিক দিয়া বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষেরও সহযোগিতা ছিল ঃ

"It is evident from the documents quoted by Gamelin that the idea of attacking Baku and Batum was explored and studied in the autumn of 1939, that is, in the very first days of war. It was an item on the agenda at many meetings of the French General Staff and had been approved in principle. At a meeting of the General Staff on March 25, 1940, the establishment of British and French co-operation with a view to joint operations against Baku was reported." ('New Times', ১৭ই মার্চ, ১৯৪৭, দ্রষ্টব্য)

অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়ার আপন শক্তির জন্য ফিনল্যাণ্ড যুদ্ধের অবসান হইল। কিন্তু যে প্রতিক্রিয়াশীল মারাত্মক মতবাদ ১৯৩৯-৪০ সালের সামরিক মহলে ছিল, পরবর্তীকালেও তাহার অভাব দেখা যায় নাই এবং এই মনোভাবের

ফলেই ১৯৪২ সালের সংকটের দিনে (যখন মলোটোভ লণ্ডনে গিয়াছিলেন পশ্চিমে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার আবেদন লইয়া) পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার দাবী প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল, যে দাবীর কথা ১৯৪২ ও ১৯৪৩এর নভেম্বরের বক্তৃতায় স্বয়ং ষ্ট্যালিনও উল্লেখ করিয়াছিলেন। পরে জানা গিয়াছিল যে, চার্চিলের রাজনৈতিক মতবিরোধিতার জন্যই ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা সম্ভব হয় নাই।......

"......it has been revealed in the memoires of Captain Butcher, aide-de-camp of General Eisenhower, that General Eisenhower and his military experts favoured the Second Front in Europe in the summer of 1942, that the opposition came primarily, not from military, but from political sources, and that the decisive opposition which blocked and delayed the Second Front came—what could not be stated at that time—from Churchill. When Churchill's decision to ban the Second Front in 1942 was conveyed to General Eisenhower, General Eisenhower called it 'the blackest day of the war'." (আর পাম্ দত্ত সম্পাদিত "Labour Monthly", এপ্রিল সংখ্যা, ১৯৪৬, দ্রষ্টব্য)।

মার্কিণ সেনাপতি জেনারেল আইসেনহাওয়ার পর্যন্ত যে ঘটনাকে 'যুদ্ধের কৃষ্ণতম দিবস' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই সম্ভব হইয়াছিল স্বয়ং চার্চিলের জন্য! সোভিয়েট বিদ্বেষের সেই পুরাতন ব্যাধি কেবল ১৯৪২ সালেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার প্রতিবন্ধকরূপে দেখা দিল না, ১৯৪৩ সালেও ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটিল এবং শেষ পর্যন্ত ইহা সম্ভব হইল গিয়া ১৯৪৪ সালের মধ্যভাগে!

"According to Harry Hopkins, Eden, after considerable discussions, proposed that a Second Front be opened in the spring of 1943. This was ultimately agreed to. But Churchill and his advisers continued to resist and it was not started until the middle of 1944." ('The Case for Communism'—by William Gallacher M.P., ১৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

যে চার্চিলের বিরোধিতার জন্য ১৯৪৪ সালের মধ্যভাগের আগে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা সম্ভব হইল না, সেই চার্চিলেরই অনুরোধ ষ্ট্যালিন কিভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন মিত্রবাহিনীকে ত্রাণ করিবার জন্য সেই ঘটনাও এখানে

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জার্মাণ বাহিনী পশ্চিম রণাঙ্গনে অকস্মাৎ এক নিদারুণ পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া ইঙ্গ-মার্কিণ বাহিনীকে ঘোরতর বিপাকে ফেলিয়াছিল। তখন চার্চিল ষ্ট্যালিনের নিকট এই মর্মে এক তারবার্তা প্রেরণ করেন যে, পশ্চিমের যুদ্ধের এই ঘোরতর অবস্থা হ্রাস করিবার জন্য পূর্ব রণাঙ্গনের কোনও স্থানে—যেমন ভিশ্চুলা নদী এলাকায় বা অন্য কোথাও রুশ বাহিনীর পক্ষে কোনও বড় রকমের আক্রমণ জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠান করা সম্ভব কিনা এবং 'সেই আক্রমণের উপর আমরা নির্ভর করিতে পারি কিনা?'......

ইহার উত্তরে ষ্ট্যালিন জানাইলেন যে, তাঁহারা একটি বড় আক্রমণের আয়োজন করিতেছেন, কিন্তু শীতের আবহাওয়ার জন্য বিঘ্ন ঘটিতেছে। তথাপি এই আবহাওয়াকে অগ্রাহ্য করিয়াই পশ্চিম রণাঙ্গনের মিত্র বাহিনীকে সাহায্য দেওয়ার জন্য যথাসম্ভব শীঘ্রই—জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহের বেশী দেরী হইবে না—একটি প্রকাণ্ড আক্রমণাত্মক অভিযান চালানো হইবে। 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন যে, আমাদের পক্ষে মিত্র বাহিনীর জন্য যাহা কিছু করা সম্ভব, তাহাই করা হইবে।'.

ইহার পর পূর্ব রণাঙ্গনে ষ্ট্যালিনের প্রতিশ্রুত সেই আক্রমণ ঘটিল এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্র বাহিনী উদ্ধার পাইল। চার্চিল কৃতজ্ঞতায় গদগদকণ্ঠ হইলেন। (পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

এভাবে মহাযুদ্ধের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, সোভিয়েট রাশিয়া মিত্রপক্ষের সঙ্গে আন্তরিক সহযোগিতায় কোন কৃপণতা করে নাই। কোন মতবাদের বা সংস্কারের জের টানিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষকে প্রয়োজনের দিনে সাহায্য করিতে কিম্বা রাজনৈতিক বৈঠকগুলিতে যথাসম্ভব আপোষ-মীমাংসা করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হয় নাই। কিন্তু মিত্রপক্ষের রক্ষণশীল নেতৃবৃন্দ জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে ক্লিষ্ট রাশিয়াকে তেমনভাবে বিশ্বাস করেন নাই, এবং যতটা সাহায্য দেওয়া উচিত ছিল, তাহাও দেন নাই। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে যে, ষ্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধের ফলেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মোড় ফিরিয়াছিল, আসুরিক বলশালী জার্মাণীর পরাজয় সম্ভব হইয়াছিল। এমন কি ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে জাপানের দ্রুত পরাজয়ও রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার জন্যই সম্ভব হইয়াছিল। এবং সেকথা মার্কিণ ও বৃটিশ কর্তৃপক্ষও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। বহু সরকারী নথীপত্রেও ইহার প্রমাণ আছে। রাশিয়ার এই অভূতপূর্ব সংগ্রাম ও

আত্মত্যাগের ফলেই লক্ষ লক্ষ মার্কিণ ও বৃটিশ সৈন্য অক্ষত শরীরে দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিয়াছিল। কারণ, মহাযুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতির অধিকাংশই রাশিয়ার ঘাড়ের উপর দিয়া গিয়াছে এবং জার্মাণ বাহিনীর অধিকাংশের বিরুদ্ধে রাশিয়া একক হস্তে লড়িয়াছে ঃ

"Nine out of every ten Germans were killed by the Red Army. The Soviet engaged 257 Nazi divisions before the Second Front, and after it 204 divisions, while the combined British, American and Canadian forces faced 75 Nazi divisions."—(W. Gallacher)

জার্মাণীর প্রত্যেক ১০টি সৈন্যের মধ্যে ৯টিই নিহত হইয়াছিল লাল-ফৌজের দ্বারা এবং দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার আগে ২৫৭ ডিভিসন নাৎসী সৈন্যকে রাশিয়া রণলিপ্ত রাখিয়াছিল এবং দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার পর ২০৪ ডিভিশন! আর মার্কিণ, বৃটিশ ও কানাডীয় বাহিনী সমবেতভাবে মাত্র ৭৫ ডিভিসন নাৎসী বাহিনীর সম্মুখীন হইয়াছিল।

মহাযুদ্ধের এই মহামৈত্রীর ফলে রাশিয়ার ৭০ লক্ষ লোক নিহত এবং হতাহত হইল, নিখোঁজ ও মৃত ইত্যাদি লইয়া এই সংখ্যা দেড় কোটি ছাড়াইয়া গেল, যাহা প্রথম মহাযুদ্ধের সমগ্র নিহতের সংখ্যার চেয়েও বেশী! আর ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষের সৈন্যক্ষয় কিরূপ হইয়াছে?—

"The Soviet Union lost seven million dead. • The total of Anglo-American losses has been compared by noble speakers in the House of Lords on traffic problems to peace-time road casualties!"—(R. Palme Dutt). অর্থাৎ শান্তির সময়ে যানবাহন সমস্যায় রাস্তার দুর্ঘটনায় যত লোক হতাহত হয়, ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষের সৈন্যক্ষয় তার চেয়ে বেশী হয় নাই—ইংলণ্ডের হাউস অব লর্ডসের অভিজাত বক্তাগণের তুলনামূলক বিচারেই ইহা প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু অপরিমিত সৈন্য ও লোকক্ষয়ের পর রাশিয়ার বৈষয়িক ক্ষতি কিরূপ হইয়াছে? ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে মঃ মলোটোভ পররাষ্ট্র-সচিবদের বৈঠকে এই বিষয়ে বিস্তৃত তালিকা পেশ করিয়াছিলেন, যাহা হইতে সংক্ষেপে বলা যায় যে, নাৎসী আক্রমণ ও অধিকারের ফলে রাশিয়ার ১,৭০০ সহর ধ্বংস, ৭০ হাজার গ্রাম ভস্মীভূত, ৬০ লক্ষ অট্টালিকা বিনষ্ট, যাহার ফলে ২ কোটি ৫০ লক্ষ লোক

গৃহহারা হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে ৩২ হাজার কল-কারখানা, খনি, বৈদ্যুতিক-শক্তি উৎপাদন-কেন্দ্র ইত্যাদি, ৪০ হাজার মাইল রেলপথ, ৪,১০০ রেল ষ্টেশন, ৪০ হাজার হাসপাতাল, ৪০ হাজার পাব্লিক লাইব্রেরী, ৮৪ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস ও লুণ্ঠিত হইয়াছে। ৪০ লক্ষ শ্রমিকের শ্রমশালা, ৯৮ হাজার সমবায়মূলক কৃষি ফার্ম, ১৮৭৬ ষ্টেট ফার্ম, ৭০ লক্ষ অশ্ব এবং কয়েক কোটি গরু-ভেড়া-ছাগল কিম্বা পশুসম্পদ নষ্ট হইয়াছে। ষ্টেট কমিশনের হিসাব অনুযায়ী প্রত্যক্ষভাবে এই বৈষয়িক ক্ষয় ও ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ডলারের হিসাবে ১২ হাজার ৮০০ কোটি ডলার। আর জার্মাণী ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে গিয়া সর্বপ্রকার ব্যয় ও ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৩৫ হাজার ৭০০ কোটি ডলার। ('Problems of Foreign Policy'— মলোটোভের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

আর মিত্রপক্ষের নিকট হইতে রাশিয়া ইজারা ও ঋণ মারফৎ যে বৈষয়িক সাহায্য পাইয়াছিল তাহা লইয়া আমেরিকা যথেষ্ট গর্ব করিয়াছে বটে, কিন্তু উহারও তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় যে, সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎপাদনশক্তিই রাশিয়াকে রক্ষা করিয়াছে, ইঙ্গ-মার্কিণ সাহায্য নয়। তুলনামূলক সরকারী তালিকা উদ্ধৃত করা যাউক—যেমন, ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাস হইতে ১৯৪৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত মিত্রপক্ষ নিম্নরূপ সাহায্য দিয়াছেনঃ—ট্যাঙ্ক ৯,২১৪, বিমান ১২,২৫৮, ট্যাঙ্ক ও বিমান-মারা-কামান ৩১,২৬৫, গোলা ৪ কোটি ২০ লক্ষ এবং কার্তুজ ১৩,১৬০ কোটি ২০ লক্ষ। আর ১৯৪২ সালের জুন মাস হইতে ১৯৪৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত রাশিয়ার নিজস্ব উৎপাদন এইরূপ ছিলঃ—৯০ হাজার ট্যাঙ্ক, ১ লক্ষ ২০ হাজার বিমান, ৩ লক্ষ ৬০ হাজার কামান এবং একমাত্র ১৯৪৪ সালেই ২৪ কোটি গোলা, ৭৪০ কোটি কার্তুজ। অতএব রাশিয়ার যুদ্ধজয়ে মিত্রপক্ষের সামরিক সাহায্যের পরিমাণ কতটুকু ছিল? খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ডাঃ মেঘনাদ সাহার মতে (যিনি ১৯৪৫ সালের জুন মাসে মস্কোতে গিয়াছিলেন) জার্মাণীর বিরুদ্ধে নিয়োজিত সমর-সম্ভারের শতকরা ৯০ ভাগ একমাত্র রাশিয়াই উৎপাদন করিয়াছিল! (লেখক কর্তৃক রচিত 'রুশ-জার্মাণ সংগ্রাম' দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়া যে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল, যে অভূতপূর্ব ত্যাগ স্বীকার সে করিয়াছিল, তাহা দ্বারা রাশিয়ার কেবল নিজের নহে পৃথিবীর বিপন্ন মনুষ্য জাতিরও মুক্তিবিধানে প্রভূত সাহায্য করা হইয়াছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে রাশিয়া মহাযুদ্ধে অপরাজেয় বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল

তাহার পর হইতেই মিত্রপক্ষের রক্ষণশীল সমাজ যুদ্ধে জয়লাভের চেয়েও আগামী দিনের পৃথিবীর কল্পিত সাম্যবাদীয় ভীতির দ্বারা রাশিয়ার নিকট হইতে হাত গুটাইতে লাগিল এবং রণনীতির দাবীর উপর কূটনৈতিক আধিপত্যের চেষ্টা হইতে লাগিল। অতএব মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তেহরাণ-ইয়াল্টা-পটসডাম যুগেরও অবসান হইল এবং মহা-মৈত্রী মহা-মরীচিকায় পরিণত হইল।

ইউরোপের ঠাণ্ডা লড়াই—১৯৪৫-৫০

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইল বটে, কিন্তু শান্তি আসিল না। এমন কি ১৯১৪—১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের পর লোকার্ণো-চুক্তি ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের জেনেভার আবহাওয়ায় যে কয়েক বৎসর বাহ্যিক শান্তি ছিল, ১৯৩৯-৪৫এর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেটুকুও দেখা গেল না। এবারের মহাযুদ্ধে পৃথিবীর অর্থনৈতিক ভিত্তি যেমন প্রচণ্ড মার খাইল, তেমনই সমাজের রক্ষণশীল ও স্থিতিশীল শক্তিগুলি ভাঙিয়া গেল। জনসাধারণ নূতনতর রাষ্ট্রিক ও সামাজিক মুক্তি দাবী করিতে লাগিল। সেবারের বিভিন্ন শান্তি বৈঠকে ও সন্ধিপত্র রচনায় আমেরিকাসহ ধনতান্ত্রিক শক্তিবর্গ সহজেই একমত হইতে পারিয়াছিলেন একই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য এবং নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্র শৈশব দশায় নিতান্ত বিপন্ন ছিল বলিয়া তাহাকে উপেক্ষা করাও সহজ ছিল। কিন্তু এবারের মহাযুদ্ধের প্রধান অংশীদার ও বিজেতারূপে দেখা দিল রাশিয়া এবং অপর পক্ষে আমেরিকা। ফলে, পৃথিবী দুই শিবিরে বিভক্ত হইল সমাজতন্ত্র-বাদী ও ধনতন্ত্রবাদীর মধ্যে, যাহা মহাযুদ্ধের সময় ছিল ফ্যাসিস্ট ও ফ্যাসিস্ট-বিরোধীদের মধ্যে। দুই দিক হইতে দুই প্রচণ্ড শক্তির সংঘাত সুরু হইল, যাহা বিভক্ত জার্মাণীর বার্লিন সহরকে কেন্দ্র করিয়া ইউরোপের 'ঠাণ্ডা লড়াই' বা 'cold war' নামে খ্যাত হইয়াছে।

কিন্তু কেন এরূপ ঘটিল এবং এই অবস্থার মৌলিক কারণগুলি কি? পূর্ববর্তী প্রবন্ধেই দেখানো হইয়াছে মিত্রপক্ষের এক শ্রেণীর রক্ষণশীল নেতারা কিভাবে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির দাবী লইয়া চাতুরী খেলিয়াছেন। কারণ, তাঁহারা যুদ্ধের সময় 'এক গুলীতে দুই বক মারিতে' চাহিয়াছিলেন। কিম্বা কূটনীতির ভাষায় বলা যায় যে, তাঁহারা 'double strategy' খাটাইতে

চাহিয়াছিলেন, যদিও তখন প্রকাশ্যে কোন সরকারী ভাষণে ইহার পরিচয় ছিল না। পশ্চিমের ধনতন্ত্রবাদিগণ সেই সময়ে সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতায় হিটলারকে বধ করিতে চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহারা মহাযুদ্ধের ধাক্কায় সোভিয়েট শক্তিরও পতন আশা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ জার্মাণীর পরাজয়ের দ্বারা ফ্যাসিষ্ট-শক্তি চূর্ণ হইবে বটে, কিন্তু উহার ফলে কমিউনিজমের অগ্রগতি যেন না ঘটে, কিম্বা ইউরোপে ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী বিপ্লবের দ্বারা পুরাতন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান এবং সোভিয়েট শক্তির পরিপুষ্টি যেন না হয়। আরও সোজা করিয়া বলা যায় যে, জার্মাণী ও রাশিয়া উভয়ে ঘায়েল হইবার পর যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিবর্গের শাসন ও আধিপত্য যেন বজায় থাকে এবং বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ষ্ট্যালিনগ্রাদে রাশিয়ার যুগান্তকারী জয়লাভের পর রক্ষণশীল শক্তিবর্গের এই প্রত্যাশা শিথিল হইয়া গেল। তখন তাঁহারা বিজয়ী রাশিয়াকে সমান অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করিয়া যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর শান্তি, পুনর্গঠন ও নিরাপত্তার সমস্যাগুলি মিটাইবার চিন্তা করিলেন (অবশ্য তখনও মহাযুদ্ধ পূর্ণবেগে চলিতেছিল) এবং এই চিন্তা হইতেই তেহরাণ, ইয়াল্টা ও পটসডামের ঐতিহাসিক বৈঠকগুলি অনুষ্ঠিত এবং রাশিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সমস্ত চুক্তি এবং সর্তই ভাবী পৃথিবীর শান্তি ও গণতান্ত্রিক মীমাংসার আসল ভিত্তি রচনা করিয়াছিল এবং পরে এগুলির অস্বীকৃতির দ্বারাই নূতন করিয়া বিরোধ ও অশান্তি দেখা দিল।

"It is the violation and even repudiation of these pledges by the Western Powers, once the danger of war has passed, that underlies all the present difficulties. The Teheran and Crimea agreements, solemnly signed on behalf of Britain, the United States and the Soviet Union, had laid down the basis of Three-Power collaboration and leadership in the post-war world as the indispensable foundation of peace and condition of suceess of the United Nations, the only alternative to which would mean the renewal of rivalries and antagonism, Two-Power combinations against a third, and all the instability of balance of power politics."—(R. Palme Dutt)

যেই যুদ্ধের বিপদ কাটিয়া গেল, অমনি পশ্চিমের শক্তিবর্গ তেহরাণ, ইয়াল্টা ও পটসডাম বৈঠকের প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গিতে লাগিলেন। অথচ এই প্রতিশ্রুতি

অনুসারে ত্রি-শক্তির সহযোগিতাই ছিল পৃথিবীর শান্তিরক্ষা ও ইউ-এন-ও'র সাফল্যের অপরিহার্য ভিত্তি এবং ইহারই অভাবে সেই পুরাণো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বৈরিতা দেখা দেওয়ার কথা এবং সেই অবস্থায় ইহাদের যে-কোন দুই শক্তি মিলিয়া তৃতীয়ের বিরুদ্ধে জোট পাকাইবে এবং ক্ষমতার ক্ষুধাজনিত রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার সেই পুরাণো অনিশ্চয়তা দেখা দিবে! —কার্যতঃ তাহাই ঘটিয়াছে। মহাযুদ্ধের তিন প্রধানের মধ্যে দুইজন, আমেরিকা ও বৃটেন, একপক্ষে গিয়াছে এবং তৃতীয় জন বা রাশিয়া পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত আগে, যেমন ১৯৩৬—৩৯ সালে পশ্চিমের গণতন্ত্রী শক্তিবর্গ সোভিয়েট রাশিয়াকে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন (isolate) করিয়াছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৫—৫০ সালের ইংগ-মার্কিণ কূটনীতিও তেমনই বর্তমান রাশিয়াকে ইউরোপে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে এবং সেদিন যেমন ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গের নানা স্থানে আক্রমণ ও যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, এবারও তেমনই অন্ততঃ পূর্ব এশিয়ায় কোরিয়াতে আক্রমণ ও যুদ্ধ চলিতেছে। কিন্তু সেদিনের তুলনায় আজিকার রাশিয়া আরও শক্তিশালী—ইউরোপ ও এশিয়ায় অন্ততঃ ৮০ কোটি লোকের কিম্বা পৃথিবীর মনুষ্যজাতির এক তৃতীয়াংশের উপর আজিকার কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের প্রভাব! আর ঠিক এই কারণেই বৃটেন ও আমেরিকার শাসকগোষ্ঠী আরও বেশী উগ্র এবং আরও বেশী কঠোর হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, ১৯৪৪ সাল হইতে বিজয়ী লালফৌজ পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িতেছে, যাহার ফলে পশ্চিম জার্মাণীর এলব্ নদী হইতে আদ্রিয়াতিক উপসাগর এবং পূর্ব এশিয়ার চীন উপসাগর পর্যন্ত কমিউনিষ্ট প্রাধান্য বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। আর হিটলারবিধ্বস্ত পশ্চিম ইউরোপীয় রাজ্যগুলিতে আর্ত জনগণ নূতন বৈপ্লবিক আবর্তে পড়িতেছে। কেহ কেহ অনুমান করিলেন যে, ফরাসী বিপ্লবের পর নেপোলিয়নের বিজয়ী সৈন্যবাহিনী যেমন ইউরোপ করায়ত্ত করিতে এবং সামন্ততন্ত্রের অত্যাচার হইতে ইউরোপকে মুক্তি দিতে উদ্যত হইয়াছিল "লাল নেপোলিয়ন"রূপে ষ্ট্যালিনও বোধ হয় লালফৌজকে সেই ভূমিকায় নিয়োগ করিতেছেন! (Russian Revolution by M. N. Roy দ্রষ্টব্য)। সুতরাং পশ্চিমের শাসকগোষ্ঠী মহলে একটা অসুস্থ উত্তেজনা দেখা দিল—"আক্রমণশীল সোভিয়েট সাম্যবাদের দুনিয়া গ্রাসের" আর্ত চীৎকার ইংগ-মার্কিণ মহল হইতে ধ্বনিত হইল, যাহার আবরণে সেই পুরাণো শাসন ও কায়েমী স্বার্থরক্ষার অভিযান সুরু হইল। রচিত হইল মার্শাল প্ল্যানের প্রকাণ্ড অর্থ-নৈতিক নাগপাশ, পশ্চিম ইউরোপের ব্রুসেলস-চুক্তি এবং অতলান্তিক-চুক্তির

সামরিক রাখী-বন্ধন। তেহরাণ-ইয়াল্টার সহযোগিতার নীতি পরিত্যক্ত হইল এবং বৃটেন ও আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি নূতন খাতে প্রবাহিত হইল—১৯৪৯ সালের গোড়ার দিকে সোভিয়েট পররাষ্ট্র দপ্তর যে নীতিকে পুরাণো পন্থার প্রত্যাবর্তন-রূপে অভিহিত করিয়াছিলেন— "A reversion to the old anti-Soviet line of foreign policy—the line of isolating the U. S. S. R—which they pursued in the years preceding the second world war and which almost brought European civilization to disaster."

পশ্চিমের শাসকবর্গ সেই পুরাণো সোভিয়েট-বিদ্বেষের ভূমিকায় প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং বিশেষভাবে জার্মাণী ও বার্লিনের প্রশ্নে তীব্র বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পটসডাম ও ইয়াল্টা-চুক্তি লঙ্ঘন করিতে এমন কি অস্বীকার করিতে পর্যন্ত লাগিলেন, নানা প্রকার খুঁটিনাটি ও বিকৃত ব্যাখ্যার দ্বারা। আমেরিকায় প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সরকার এবং জন ফষ্টার ডুলেস প্রমুখ উগ্রপন্থিগণ এমন পর্যন্ত ঘোষণা করিলেন যে, পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ইয়াল্টা বৈঠকে ষ্ট্যালিনকে খুসী করিবার জন্য 'তোষণনীতির' প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, যাহা অনুসরণ করিলে সোভিয়েট প্লাবনে দুনিয়া ভাসিয়া যাইবে! অতএব বার্লিন, জার্মাণী, পশ্চিম ইউরোপ, ইতালী, গ্রীস, তুরস্ক এবং ইরাণ ও মধ্যপ্রাচ্য হইতে সুরু করিয়া জাপান, কোরিয়া, চীন ইত্যাদি পর্যন্ত সর্বত্র এবং সমস্ত প্রশ্নে রাশিয়ার 'গণতান্ত্রিক শান্তি ও মীমাংসার' দাবী দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হইতে লাগিল। এমন কি ইয়াল্টা-চুক্তি অনুযায়ী তাহার "প্রত্যক্ষ বৈষয়িক ক্ষতির" শতকরা মাত্র ১০ ভাগেরও কম জার্মাণীর কলকারখানা ও সম্পত্তি হইতে পূরণের জন্য যে প্রতিশ্রুতি মিত্রপক্ষ দিয়াছিলেন, উহার পর্যন্ত বিরোধিতা করা হইল! ("Problems of Foreign Policy" by Molotov গ্রন্থের এতৎসংক্রান্ত বক্তৃতাগুলি দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু ষ্ট্যালিন বিজয়ী লালফৌজ সঙ্গে লইয়া নেপোলিয়নের মত ইউরোপ জয় করিতে বাহির হন নাই। চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া ইত্যাদি রাজ্যগুলি জার্মাণ ফ্যাসিষ্টদের করতলগত ছিল এবং ইহাদের অনেকেই লালফৌজের সহায়তায় নিজেদের স্বাধীনতা পুনরায় ফিরিয়া পাইয়াছিল। মিত্রপক্ষের যুদ্ধের লক্ষ্য সংক্রান্ত ঘোষিত নীতি অনুযায়ী ইহা ঘটিয়াছিল এবং ১৯৪৩ সালের নভেম্বরের বক্তৃতাতেই ষ্ট্যালিন বলিয়াছিলেন—

"In conjunction with our Allies we shall have to—(1) liberate the peoples of Europe from the fascist invaders and help them to rebuild their national states which the fascist enslavers have dismembered—the peoples of France, Belgium, Yugoslavia, Czechoslovakia, Poland, Greece and the other countries now groaning under the German yoke must again become free and independent; (2) grant the liberated peoples of Europe full right and freedom to decide what form of Government they are to have"—ইত্যাদি।

তিন প্রধানের বিভিন্ন বৈঠকেও এই মূলনীতি গৃহীত এবং জনসাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সমস্ত ঘোষণা অনুযায়ী যখন যুদ্ধের অবসানে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের কিম্বা বলকান অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি পুনরায় স্বাধীনভাবে গঠিত এবং জনগণের সোভিয়েট সমর্থনে নূতন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তেহরাণ ও ইয়াল্টা-চুক্তি স্বাক্ষরকারী ইঙ্গ-মার্কিণ মহল 'রুশ আধিপত্য', 'সোভিয়েট সাম্যবাদের' ডিক্টেটরী ইত্যাদি চীৎকার তুলিলেন এবং সেই চীৎকারই 'লাল সাম্রাজ্যবাদের' উদ্ভট এবং উৎকট ব্যাখ্যায় পরিণত হইল। পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ইত্যাদি পূর্ব-ইউরোপীয় দেশগুলি সম্পর্কে যে 'লৌহ যবনিকা'র (Iron curtain) প্রচারকার্য আজিকার পৃথিবীতে এত মুখর, সেই শব্দটি কে প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই তথ্য অনেকেরই জানা নাই। তিনি স্বনামধন্য নাৎসী প্রচারবিশেষজ্ঞ ডাঃ গোয়েবলস, যিনি রঙ্গমঞ্চ হইতে আত্মহত্যার দ্বারা বিদায় লইবার আগে প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন যে, 'লৌহ যবনিকা'র অন্তরালে পূর্ব-ইউরোপ সোভিয়েটের দ্বারা পুনর্গঠিত হইবে এবং পৃথিবী রাশিয়া ও ইঙ্গ-মার্কিণের মধ্যে বিভক্ত ও তৃতীয় মহাযুদ্ধ আবার আসন্ন হইবে! সেই গোয়েবেলসেরই কণ্ঠস্বর পরলোকের লৌহ-যবনিকা হইতে আজ অতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে!

রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরী, মহাযুদ্ধের আগে এই দেশগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। রাজা, জমিদার ও তাহাদের পোষ্যবর্গ মিলিয়া দেশের আর্থিক অবস্থাকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেলিয়াছিল এবং বহু সামাজিক কু-সংস্কার ও দুর্নীতি এবং ব্যাপক দারিদ্র্যের অত্যাচার ছিল। সুতরাং গণতন্ত্র ও জনস্বার্থের বিরোধী ফ্যাসিজম সহজেই এই দেশগুলিকে গ্রাস করিয়াছিল। আর পশ্চিমের গণতন্ত্রবাদী ইঙ্গ-ফরাসী

গভর্ণমেণ্ট চেকোশ্লোভাকিয়াকে হিটলারের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর ইউরোপীয় যুদ্ধের নরকাগ্নিতে এই দেশগুলি দগ্ধ হইল। সুতরাং এই সমস্ত দেশ যদি যুদ্ধ, অত্যাচার ও শোষণ হইতে ত্রাণ লাভের জন্য সাম্যবাদকে বরণ করে এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মত শক্তিশালী রাষ্ট্রের বন্ধুতার আশ্রয়ে আসে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহাকে "রাশিয়া কর্তৃক গ্রাস", কিম্বা পশ্চিমী রাজনৈতিক ভাষায় এগুলিকে কেবলমাত্র 'তাঁবেদার রাষ্ট্র' বলা যায় না। রাশিয়া কোনপ্রকার মার্শাল প্ল্যানের অর্থনৈতিক বন্ধনও এগুলির উপর চাপাইয়া দেয় নাই, নিজেদের উৎপন্ন মালের সস্তা বাজার হিসাবেও এই দেশগুলিকে রাশিয়া ব্যবহার করিতেছে না, যেমন আমেরিকা করিতেছে মার্শাল সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলিকে। এই সমস্ত দেশের কলকারখানা প্রতিষ্ঠায় ও শ্রমশিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাশিয়া হাতে-কলমে সাহায্য দিতেছে। জনসাধারণের এই "নয়া গণতন্ত্রের" দেশগুলি তাহাদের নিজস্ব পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসরণ করিতেছে। বিস্ময়ের কথা এই যে, এই সমস্ত দেশের শ্রমশিল্পের উৎপাদন ইতিমধ্যেই মহাযুদ্ধের পূর্বেকার তুলনায় অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেমন, ১৯৪৯ সালে পোল্যাণ্ডে শতকরা ৭৪ ভাগ, হাঙ্গেরীতে ৪০ ভাগ এবং চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও আলবেনিয়াতেও এই ধরণের বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। এবং শ্রমিক ও কর্মচারী সমাজের উপার্জনও বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৫০ সালে এই অবস্থার আরও উন্নতি ঘটিয়াছে এবং উৎপাদন বাড়িয়াছে।—যেমন, ১৯৪৯ সালের তুলনায় চেকোশ্লোভাকিয়ায় শতকরা ১৬ ভাগ, বুলগেরিয়ায় ২০ ভাগ, পোল্যাণ্ডে ২৫ ভাগ, আলবেনিয়ায় ৩৪, রুমানিয়ায় ৩৮ ভাগ এবং হাঙ্গেরীতে ৩৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই দেশগুলিতে বিদেশীদের যে ব্যবসায়-বাণিজ্য ছিল, উহার উচ্ছেদ ঘটিয়াছে। সুতরাং এগুলি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে কেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ ও প্রচারকার্য চলিতেছে। বিশেষতঃ যখন যুগোশ্লাভিয়ায় টিটোর দল রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও মার্ক্সীয় পন্থা ত্যাগ করিয়াছে এবং নয়া গণতন্ত্রের দেশগুলিতে ছদ্মবেশী টিটোর দল ও পুরাতন বুর্জোয়া-শাসনপন্থীরা দেশের গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছে, যেমন ১৯৩৪-৩৬ সালে রাশিয়ায় ঘটিয়াছিল ট্রটস্কি-পন্থীদের ষড়যন্ত্র।

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট অতি দ্রুত এই নয়া গণতন্ত্রের দেশগুলিকে সরকারী-ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং ইহাদের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপনা করিয়াছেন, ইহাও ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষের ক্রুদ্ধ হওয়ার আর একটি কারণ। যুদ্ধের আগে জার্মাণী, ফ্রান্স ও বৃটেন প্রভৃতি পূর্ব-ইউরোপ ও বলকান রাষ্ট্রগুলিকে লইয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বহু ঘুঁটির চাল দিতে পারিয়াছিল এবং একের

বিরুদ্ধে অন্যকে লাগাইয়া ইউরোপে ক্ষমতালোলুপ রাজনীতির "ভারসাম্য" বজায় রাখিবার কৌশল অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু নূতন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সোভিয়েট মৈত্রীর ফলে এই সমস্ত খেলারই অবসান হইয়াছে। ইহা ছাড়া নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠী, জাতি বা সম্প্রদায়গত তীব্র বৈরিতা ও সন্ত্রাসবাদের সম্ভাবনাও নষ্ট হইয়াছে, যে সমস্ত কারণে বলকান অঞ্চলকে 'ইউরোপের বারুদাগার' বলা হইত। এই দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়া নূতন মৈত্রীতে স্বাক্ষর করিয়াছে। ১৯৪৩ সালেই যুদ্ধরত রাশিয়ায় একটি চেক্‌বাহিনী গঠিত এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে সামরিক মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তারপর ১৯৪৫ সালে পোল্যাণ্ড ও যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে (টিটোর বিদ্রোহের ফলে ১৯৪৯ সালে ইহা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে) এবং ১৯৪৮ সালে ফিনল্যাণ্ড, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়ার সঙ্গে আত্মরক্ষার মৈত্রী স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

যুদ্ধোত্তর সোভিয়েট পররাষ্ট্রীয় নীতি কোন অভাবনীয় মৌলিক দিক পরিবর্তন করে নাই, যদিও আমেরিকার সঙ্গে তীব্র বিরোধিতার জন্য প্রভূত সংঘর্ষের সৃষ্টি হইয়াছে। ১৯১৭ সালের নভেম্বরের ঘোষিত সেই "গণতান্ত্রিক শান্তি" কিম্বা ১৯২৫ সাল হইতে ষ্ট্যালিনের অনুসৃত—(১) ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহিত পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান, (২) আক্রমণকারী ও ফ্যাসিষ্ট শক্তিগুলিকে বাধাদান, (৩) পদানত ও দুর্বল রাজ্যগুলির উন্নতি ও মুক্তিবিধানে উৎসাহ দান এবং (৪) যুদ্ধের চক্রান্তে সর্বতোভাবে বাধাদান—এই সমস্ত মূলনীতি আগের মতই বজায় আছে। নিঃসন্দেহে ইহার ভিত্তিমূলে সোভিয়েট রাশিয়ার সেই পুরাতন নির্বিঘ্নতার দাবী রহিয়াছে, যাহার ফলে রাশিয়ার স্বাভাবিক ভৌগোলিক সীমানা ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির সঙ্গে আত্মরক্ষার সামরিক মিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদ বার বার দেখা যাইতেছে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষার গরজ নিশ্চয়ই কোন অপরাধের কথা নহে।

কিন্তু পররাষ্ট্রীয় নীতিতে কোন অভাবনীয় কিম্বা অস্বাভাবিক মৌলিক পরিবর্তন না ঘটিয়া থাকিলেও দীর্ঘ ছয় বৎসরের সর্বগ্রাসী সংগ্রামের জন্য পৃথিবীর রাষ্ট্রিক অবস্থার বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সেই পরিবর্তনের সঙ্গে চলিতে গিয়া আমেরিকার সঙ্গে দ্বন্দ্বে রাশিয়ার পররাষ্ট্রীয় নীতিও কখনও কখনও উগ্র, এমন কি বৈপ্লবিক বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। কিন্তু ইহা বাহিরের আঙ্গিকের পরিবর্তন মাত্র, ভিতরের সেই শান্তিপূর্ণ মনোভাবের কোন শিথিলতা ঘটে নাই।—ঘটিতে পারে না এজন্য যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সংগঠন ও জনকল্যাণই বড় কথা

এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত রাশিয়ার পক্ষে এই পুনর্গঠন একান্ত অপরিহার্য। ইহার জন্য যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৪৬ সালে আবার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রবর্তন করা হইয়াছে, ১৯৫০ সালে যাহার প্রথম পর্যায় শেষ হইয়াছে। ইহার জন্য ভিতরে ও বাহিরে শান্তি চাই এবং ঠিক এ কারণেই সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতিতে শান্তির লক্ষ্য বড় না হইয়া পারে না। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মঃ ঝদানোভ যুদ্ধোত্তর সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতির বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছিলেনঃ

"The end of the Second War confronted all the freedom-loving nations with the cardinal task of securing a lasting democratic peace, sealing victory over fascism. In the accomplishment of this fundamental task of the post-war period, the Soviet Union and its foreign policy are playing a leading role. This follows from the very nature of the Soviet Socialist state, to which motives of aggression and exploitation are utterly alien and which is interested in creating the most favourable conditions for the building of a Communist society. One of these conditions is external peace. As the embodiment of a new and higher social system, the Soviet Union reflects in its foreign policy the aspirations of progressive mankind, which desires lasting peace and has nothing to gain from a new war hatched by capitalism."

তথাপি ইউরোপে ঠাণ্ডা লড়াই চলিতেছে কেন? কারণ, মহাযুদ্ধের মৈত্রী এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বৈঠকের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাশিয়া বিজিত দেশগুলি সম্পর্কে পূর্ণ গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করিতে চাহিতেছে এবং এই নীতি অনুযায়ী সমস্ত ফ্যাসিষ্ট সংগঠন, নাৎসীবাদের মূল উপাদান, ভবিষ্যৎ যুদ্ধের অনুকূল সমস্ত সমর-শিল্প ও সামরিক পণ্য উৎপাদনের সংস্থাসমূহ (বিশেষভাবে জার্মাণী ও জাপানের) লোপ করিবার এবং যুদ্ধবিলাসীদিগকে উৎখাত করিবার দাবী জানাইতেছে। নিরস্ত্রীকৃত জার্মাণীতে কেন্দ্রীয় শাসনাধিকার-সম্পন্ন একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, চতুঃশক্তির দখলকারী সৈন্যদিগকে প্রত্যাহার করা এবং জনগণের স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী গঠিত জার্মাণ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে একটি শান্তিসন্ধি স্বাক্ষর করা—এই সমস্তই হইতেছে বিভক্ত জার্মাণীর সমস্যা-মীমাংসাকল্পে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রস্তাব, যাহা একান্তরূপে পটসডাম চুক্তির অন্তর্গত। রাশিয়া নাৎসী জার্মাণীর বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম চালাইলেও

জার্মাণ জাতিকে কিম্বা রাষ্ট্রকে এভাবে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ধ্বংস করিবার সংকল্প কখনও পোষণ করে নাই। রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করা হইতেছে, যাহা মহাযুদ্ধের সময়ও চল্‌তি ছিল। সেই সময় ১৯৪২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী মঃ ষ্ট্যালিন দেশরক্ষাসচিবরূপে যে নির্দেশনামা প্রচার করেন. তাহাতে তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেনঃ

"Sometimes the foreign press publishes twaddle to the effect that the Red Army's aim is to exterminate the German people and to destroy the German State. This, of course, is a silly fable and stupid calumny against the Red Army. The Red Army has not and can not have such idiotic aims...It is highly probable that the war for the liberation of our Soviet soil will lead to the expulsion or destruction of Hitler's clique...But it would be ludicrous to identify Hitler's clique with the German people, with the German State. The experience of history shows that Hitlers come and go, but the German people and the German State live on."

জার্মাণী কর্তৃক ভয়ংকর আক্রমণের দিনেও জার্মাণ জাতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কে ষ্ট্যালিনের এই ঘোষণা! —'হিটলারেরা আসে, হিটলারেরা যায়, কিন্তু জার্মাণ জাতি ও জার্মাণ রাষ্ট্র চিরন্তন।' পশ্চিমের শক্তিবর্গও মুখে জার্মাণ জাতির ঐক্যের কথা বলিতেছেন বটে, কিন্তু পটসডাম চুক্তি মানিতেছেন না।—কেন? কারণ, ইউরোপে জার্মাণীর গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক ও রণনৈতিক অবস্থান. জার্মাণীর প্রভূত কলকারখানা ও অন্তর্নিহিত সামরিক শক্তি এবং রুঢ় অঞ্চলের খান ও শ্রমশিল্পের অগাধ ঐশ্বর্য পটসডাম চুক্তি অনুসারে চলিতে গেলে পাছে ইংগ-মার্কিণ-ফরাসী কর্তৃত্বের বাহিরে চলিয়া যায় এবং জার্মাণ জনগণ বিজয়ী সোভিয়েট কমিউনিজমের পাল্লায় পড়ে, এই আশংকায় যত প্রকারে সম্ভব তাঁহারা বাধা দিতেছেন এবং কোন আলোচনা বৈঠকেই রাশিয়ার সংগে একমত হইতেছেন না। অথচ রাশিয়া আপোষ-মীমাংসার জন্য ন্যায়সংগত ক্ষতিপূরণের নিম্নতম দাবী পর্যন্ত শিথিল করিয়াছিল। পশ্চিমী শক্তিবর্গের গণতান্ত্রিক মীমাংসা-বিরোধী মনোভাবের ফলেই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের তুহিন আবর্ত সৃষ্টি হইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত জার্মাণী পূর্বে ও পশ্চিমে দুইটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মূলে রহিয়াছে মার্কিণ শাসকগোষ্ঠী ও বণিকগোষ্ঠীর নূতন

জঙ্গীবাদ এবং ডলারতন্ত্র, যাহার সঙ্গে তাল দিয়া চলিয়াছেন বৃটিশ ও ফরাসী শাসকমহল নিজেদের ক্ষীয়মান ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের শেষরক্ষার জন্য!

কিন্তু সোভিয়েট পররাষ্ট্রীয় নীতি শান্তির সন্ধান করিলেও যে-কোন মূল্যে ও যে-কোন সর্তে তাহা ক্রয় করিতে রাজী নহে। মূল নীতি, আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে রাশিয়া অবিচলিত এবং অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহারা এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, প্রচ্ছন্ন বা প্রত্যক্ষ কোন সাম্রাজ্যবাদ, গণতন্ত্রবিরোধী কোন প্রকার ফ্যাসিজম এবং কোন আক্রমণ ও যুদ্ধায়োজন বরদাস্ত করিতে কিম্বা ঔপনিবেশিক দাসত্ব জীয়াইয়া রাখার কোন ব্যবস্থাকে অনুমোদন করিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। এ বিষয়ে মার্কিণ উগ্রতাকে তাঁহারা সমান দৃঢ়তার সঙ্গে লড়িতেছেন। সংবাদপত্রে, রেডিওতে এবং ইউ-এন-ও'র আন্তর্জাতিক অধিবেশনে ও পররাষ্ট্র-সচিবদের সম্মেলনে সোভিয়েট নীতি ও আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া কঠিনভাবে লড়িতেছেন। সুতরাং এই পররাষ্ট্রীয় শান্তিনীতি নেতিবাচক নহে, দস্তুরমত সক্রিয় এবং বেগবান, যাহার ধাক্কায় ওয়াশিংটন, লণ্ডন, প্যারিস ইত্যাদি বার বার উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। এই সক্রিয় বেগবান নীতি আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়া নূতনতর "ট্রুম্যনীয় ডক্টিনে" (Truman Doctrine) ও ডলারতন্ত্রের বিরোধী এক ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ক্রমাগত সেই সংঘর্ষে তৃতীয় মহাযুদ্ধের কৃষ্ণমেঘ-বিচ্ছুরিত বিদ্যুদ্দীপ্ত প্রকাশ পাইতেছে। গ্রীস বা কোরিয়া, ইন্দোচীন বা মধ্যপ্রাচ্য, জার্মাণী কিম্বা জাপান, পশ্চিম-ইউরোপ বা পূর্ব-এশিয়া—সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার রূপ স্পষ্ট এবং তীব্র, যাহা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের অগ্রগতিরূপে প্রচারিত হইয়া বিভিন্ন দেশের শাসকমণ্ডলীকে ভীত ও উৎকণ্ঠিত করিতেছে।

যদি যুদ্ধোত্তর ইউরোপের এই কঠিন রাজনৈতিক সংগ্রামের একটা তারিখ নির্দেশ করিতে হয়, তবে, ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ওয়ারশ সম্মেলনের উল্লেখ করিতে হইবে, যখন ইউরোপের ৯টি দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি মিলিত হইলেন এবং কোমিনফর্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন পারস্পরিক সংবাদ আদান-প্রদান ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য। ফ্রান্স এবং ইতালীর কমিউনিষ্ট পার্টির ডেলিগেটগণও ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের পক্ষ হইতে একটি বিবৃতি প্রচারিত হইল এবং তাহাতে—

..."The document called upon all Communist Parties to take up 'the banner of defence of their national independence

and the Sovereignty of their countries in the struggle against the current economic and political plundering by the imperialist anti-democratic bloc led by the U. S. A.' So, the Warsaw Conference and the International Communist Bureau set up by it, marked the opening of an offensive against the Marshal Plan of European recovery." ('Russian Revolution,' by M. N. Roy, ৫০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

নবভাবে গঠিত এই আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংঘ এবং সোভিয়েট সাম্যবাদী দল ইউরোপে মার্শাল প্ল্যানের বিরোধিতায় লিপ্ত হইলেন, যাহার জন্য ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালে ফ্রান্স ও ইতালী, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ড ইত্যাদিকে লইয়া এত জটিল ইতিহাসের সৃষ্টি হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের বসন্তকাল হইতে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত 'বার্লিন অবরোধের' ঘটনাবলীকেও নিশ্চয়ই ইউরোপব্যাপী এই গভীর রাজনৈতিক আলোড়ন হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এই সময় রুশ পররাষ্ট্রীয় নীতির গতি ও প্রকৃতি দেখিয়া এমন সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না যে, মহাযুদ্ধের বিজয়গর্বে রাশিয়া সম্ভবতঃ সর্বত্র সাম্যবাদীর ডিক্টেটরী চাপাইতে চাহিতেছে। কিন্তু বাহিরের প্রকাশভঙ্গীর এই উগ্রতাই শেষ কথা ছিল না। আসলে ইউরোপের ঠাণ্ডা লড়াই রাশিয়ার সংগ্রামশীল শান্তি-নীতি ও আপোষহীন গণতান্ত্রিক দাবীর সংঘর্ষে আসিয়া নূতন ঝটিকাবর্ত রচনা করিয়াছে এবং ইহারই ফলে ১৯৪৫—৫০ সালের যুদ্ধোত্তর পৃথিবী প্রত্যহ এক অভিনব দৃশ্যের অবতারণা দেখিতেছে। এই দিক দিয়া সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি পূর্বেকার তুলনায় যেমন স্বতন্ত্র, তেমনই নাটকীয় উত্তেজনার বাহক। কেননা যুদ্ধোত্তর রাশিয়া এককও নয় এবং আমেরিকার তুলনায় হীনশক্তিও নয়। এবং ইউরোপের ঠাণ্ডা লড়াইয়েরও এজন্যই অবসান হইতেছে না।

এশিয়ার গরম লড়াই—১৯৪৫-৫০

সোভিয়েট-মার্কিণ দ্বন্দ্বের জন্য যুদ্ধোত্তর ইউরোপে যখন রাজনৈতিক তুষার-ঝঞ্ঝা চলিতেছিল এবং আজও চলিতেছে, তখন এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল 'গরম লড়াইয়ের' উত্তাপে দগ্ধ। সেই দহনের তাপ চীনে, কোরিয়ায়, ফরমোজায়, ইন্দোচীনে এবং জাপান, ফিলিপাইন, মালয় ও ব্রহ্মদেশে পর্যন্ত অনুভূত হইতেছে। মধ্যপ্রাচ্যের ইরাণ, ইরাক ইত্যাদি পেট্রোল-খনি এলাকাগুলিতেও বিস্ফোরণের

আশঙ্কা জাগিয়াছে। মহাযুদ্ধের ফলে এশিয়ায় বৃটিশ, ফরাসী ও ডাচ (ওলন্দাজ) সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল নড়িয়া গিয়াছে এবং গত দুই শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদীয় শাসন ও শোষণের শক্তিগুলি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি যেমন 'আপোষে' রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, তেমনই 'আপোষহীন' গণ-মুক্তির সংগ্রাম গিয়াছে চীনদেশে। কিন্তু সোভিয়েট পররাষ্ট্রীয় নীতি এশিয়া সম্পর্কে কি ভূমিকায় অভিনীত হইতেছে?—কেবল সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা এবং পরাধীন দেশ ও উপনিবেশগুলির মুক্তি বিধানের সহায়তা বলিলেই এই ভূমিকা স্পষ্ট হইবে না। ইহার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক রূপ আছে। যেমন—(১) সোভিয়েট পূর্ব-সীমান্তের নির্বিঘ্নতা বিধান, (২) চীনে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা, (৩) ফ্যাসিষ্টপন্থী চিয়াং কাইশেক ও ট্রুম্যানপন্থী আমেরিকার উচ্ছেদ এবং (৪) যুদ্ধবাদী জাপানী সাম্রাজ্য-বাদের অবসান—এই কয়টিই দূর প্রাচ্যে সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। কোরিয়ার যুদ্ধ ইহারই অন্তর্গত।

জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার সংঘর্ষ আদৌ নূতন নহে। বর্তমান বিংশ শতকের ঊষাকালে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জারের রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে পোর্ট আর্থারের নৌ-যুদ্ধ ও জাপানের জয়লাভ এশিয়াখণ্ডের ইতিহাসে নূতন আলোড়ন আনিয়াছিল। সেই সময় জাপান পরাজিত জারের কাছ হইতে রুশীয় পূর্ব-সাইবেরিয়ার দক্ষিণ শাখালিন কাড়িয়া লইতে এবং কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ দখল করিতে পারিয়াছিল। ফলে, কামস্কাট্কা ও চুকোট্কার বন্দরসহ প্রশান্ত মহাসমুদ্রে প্রবেশের পথগুলি রাশিয়ার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তারপর ১৯১৮-২২ সালের মধ্যে রুশ গৃহ-যুদ্ধ ও বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের হস্তক্ষেপের সময়ও জাপান সোভিয়েট প্রাচ্য অঞ্চল আক্রমণ ও সাময়িকভাবে দখল করিয়াছিল। ১৯৩৮ সালে ভ্লাডিভোষ্টক বন্দরের নিকটবর্তী হাসান'হ্রদ অঞ্চলে এবং মঙ্গোলিয়া রিপাব্লিকের সীমান্তবর্তী এলাকায় জাপান পুনরায় আক্রমণ চালাইয়াছিল এবং সোভিয়েট সাইবেরিয়ান রেলপথ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল। অবশ্য রাশিয়া এই সমস্ত আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করিয়াছিল।

ইউরোপের মত এশিয়াতেও সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট নির্বিঘ্নতা ও শান্তির সন্ধান করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে নব জাগ্রত জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও সামরিকবাদ ইউরো-মার্কিণ শক্তিগুলির সঙ্গে টেক্কা দিয়া জয়লাভ করিলেও ইহা শেষ পর্যন্ত এশিয়ার বিপদ ঘটাইবে এবং বিশেষভাবে সোভিয়েটের দূরপ্রাচ্য

অঞ্চল ও চীন দেশকে গ্রাস করিবে, এই আশংকা মস্কো গভর্ণমেণ্টের ছিল। সুতরাং জাপানকে কূটনৈতিক সখ্যতার দ্বারা নিরস্ত্র করিবার জন্য রাশিয়া ১৯২৫ সাল হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু রাশিয়ার অনাক্রমণ চুক্তির প্রস্তাব বার বার প্রত্যাখ্যাত হইল এবং ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে উহা স্বাক্ষরিত হইল। উভয় দেশের সামরিক প্রয়োজনে—যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়া ও জাপানের জড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিল। অর্থাৎ জার্মাণ আক্রমণের মুখে রাশিয়া পূর্ব-রণাঙ্গনে জাপানের সহিত সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য এবং ইঙ্গ-মার্কিণের সহিত যুদ্ধের মুখে জাপান মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে রুশ আক্রমণ হইতে নিঃশংক হইবার জন্য পারস্পরিক নিরপেক্ষতার চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। চারি বৎসর ধরিয়া এই নিরপেক্ষতার চুক্তি পালিত হইবার পর ইয়াল্টা বৈঠকে মিত্রপক্ষের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাশিয়া ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে এই চুক্তির অবসান ও আগষ্ট মাসে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইহার পর ১৯৪৫ সালের ১৪ই আগষ্ট রাশিয়া জাতীয়তাবাদী চীনের সঙ্গে সামরিক মৈত্রীতে স্বাক্ষর করিল।

পঁচিশ বৎসর ধরিয়া রাশিয়ার কূটনীতি ইউরোপীয় মহাদেশে যে সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই, একমাত্র ১৯৪৫ সালের এই তিনটি ঘটনার দ্বারাই রাশিয়া সেই অসামান্য সাফল্য অর্জন করিল পূর্ব এশিয়ায় এবং এই তিনটি ঘটনাও ছিল একই সূত্রে আবদ্ধ। উহার প্রথমটি ছিল ইয়াল্টা বৈঠকের গোপন চুক্তি। ১৯৪৫ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী ইয়াল্টাতে রুজভেল্ট, চার্চিল ও ষ্ট্যালিন তাঁহাদের স্ব স্ব গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই মর্মে এক "গোপন চুক্তিতে" (Secret agreement) আবদ্ধ হইলেন যে, জার্মাণীর আত্মসমর্পণ এবং ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসানের দুই তিন মাসের মধ্যেই রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। কিন্তু উহার সর্ত এই—"(১) বহিঃ-মঙ্গোলিয়ার বর্তমান রাষ্ট্রিক অবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। (২) ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জাপান বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক রাশিয়ার উপর আক্রমণ চালাইয়া যে সমস্ত রুশ অধিকার লঙ্ঘন করিয়াছে, সেগুলি প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। যেমন—(ক) দক্ষিণ শাখালিন এবং উহার নিকটবর্তী দ্বীপগুলি রাশিয়াকে ফেরৎ দিতে হইবে। (খ) ডাইরেণ বন্দরের আন্তর্জাতিকতা স্বীকার এবং সোভিয়েট স্বার্থের প্রাধান্য রক্ষা করিতে হইবে, আর পোর্ট আর্থারকে রাশিয়ার ইজারাবন্ধ নৌ-ঘাঁটিরূপে পুনরায় মানিতে হইবে। (গ) মাঞ্চুরিয়ার উপর চীনের পূর্ণ সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করা হইবে। কিন্তু ডাইরেণ বন্দরের সঙ্গে সংযোগকারী চাইনীজ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলওয়েতে সোভিয়েট ইউনিয়নের স্বার্থ যেমন সুরক্ষিত হইবে, তেমনই এই রেলপথ দুইটি চীনের সার্বভৌম অধিকারের

আওতায় একটি সোভিয়েট-চীন কোম্পানী কর্তৃক সম্মিলিতভাবে পরিচালিত হইবে। (৩) কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ সোভিয়েট ইউনিয়নকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

বহির্মঙ্গোলিয়া এবং চীনা রেলপথ ও বন্দরগুলি সম্পর্কে জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেকের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে, যাহার ব্যবস্থা করিবেন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং ত্রিশক্তির রাষ্ট্র-প্রধানগণ এই প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, জাপানের পরাজয়ের পর রাশিয়ার এই দাবীগুলি নিঃসন্দেহে পালন করা হইবে। সোভিয়েট ইউনিয়নও চীনের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বন্ধুতা ও সামরিক মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং চীনকে জাপানী শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্য সশস্ত্র সৈন্যের দ্বারা সাহায্য করিবেন।"

ইয়াল্টা বৈঠকের এই গোপন চুক্তি সম্পর্কে হ্যারি হপকিন্সের (রুজভেল্টের পরামর্শদাতা) মন্তব্য এইঃ—"ষ্ট্যালিন রুজভেল্টের নিকট বলিয়াছিলেন যে, যদি এই সমস্ত সর্ত মানিয়া লওয়া না হয়, তবে জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে কেন যুদ্ধ করিতে হইবে, সে কথা রুশ জনসাধারণকে বুঝানো খুব শক্ত হইবে। আর যদি এই সমস্ত প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সর্ত পালন করা হয় তবে সুপ্রীম সোভিয়েট বা রাশিয়ার জনসাধারণের নিকট প্রাচ্য যুদ্ধে রাশিয়ার স্বার্থ সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দেওয়া কঠিন হইবে না।"

"According to Harry Hopkin's record, Stalin said to Roosevelt that if his conditions were not met, it would be very difficult to explain to Russian people why they must go to war against Japan......However, Stalin said if the required political conditions were met, then it would not be difficult for him to explain to the Supreme Soviet and the people just what was their stake in the Far Eastern War." (১৯৫০, অক্টোবর, "Foreign Affairs" আমেরিকাস্থিত প্রাক্তন চীনা রাষ্ট্রদূত Hu Shih লিখিত "China in Stalin's Grand Strategy" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

ইয়াল্টা বৈঠকের এই গোপন চুক্তি হইতেই রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং জাতীয়তাবাদী চীনের সঙ্গে সামরিক মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। আবার এই তিনটি ঘটনাই একত্রে এশিয়াতে যুগান্তকারী পরিবর্তন ও ঐতিহাসিক বিপ্লব ঘটাইয়াছে। এমন কি, কোরিয়ার বর্তমান যুদ্ধ (১৯৫০-৫১) যে ইহারই

পরিণতি মাত্র, সে কথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। রুজভেল্টের সঙ্গে ষ্ট্যালিন 'রাজনৈতিক দর কষাকষি' করিয়াছিলেন বলিয়া হ্যারি হপকিন্সের যে মন্তব্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সম্ভবতঃ তাহা ভিত্তিহীন নহে। কারণ, জার্মাণীর বিরুদ্ধে ১৯৪১ সালের জুন মাস হইতে একটানা অবিশ্রান্ত যুদ্ধে রাশিয়ার অভূতপূর্ব ক্ষয় ও ক্ষতির পর আবার তিন মাসের মধ্যেই জাপানের বিরুদ্ধে লড়িতে যাওয়া একটা অসম্ভব দাবী ছিল এবং সেই দাবী উঠিয়াছিল এজন্য যে, কেবল এটম্ বোমার দ্বারা জাপানকে দ্রুত অবনত করা যাইবে, এমন ভরসা মার্কিণ সেনাপতিবৃন্দ, এমন কি লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনেরও (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বাধিনায়ক) ছিল না। এমন কি এটম্ বোমা সম্পর্কে পটসডাম বৈঠকে ট্রুম্যান ষ্ট্যালিনের সঙ্গে কোন পরামর্শ করেন নাই বলিয়া সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ দাবী করিতেছেন। এই বোমা ব্যবহারের একচেটিয়া গোপন অধিকার ছিল ইঙ্গ-মার্কিণ মহলের, যাহা আজও অব্যাহত আছে—যদিও ইহার রহস্য আর সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের নিকট অজ্ঞাত নাই। কিন্তু ১৯৪৫ সালে জাপানকে অতি দ্রুত পরাজিত করা এবং মার্কিণ সৈন্যবাহিনীর ক্ষয় ও ক্ষতি যথাসম্ভব হ্রাস করাই ছিল আমেরিকার উদ্দেশ্য। এবং সেই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্যই ইয়াল্টাতে রুজভেল্ট ষ্ট্যালিনকে তাগিদ দিয়াছিলেন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে, ষ্ট্যালিনও এই যুদ্ধের মূল্য বাবদ জাপানের কাছ হইতে রাশিয়ার পূর্বেকার দাবীগুলি (১৯০৪ খৃষ্টাব্দের) পূরণের জন্য রুজভেল্ট ও চিয়াংকাইশেকের কাছ হইতে প্রতিশ্রুতি আদায় করিবেন। বিশেষতঃ রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের শত্রুতার ইতিহাসও সামান্য ছিল না এবং আজও জাপানের শাসকগোষ্ঠী ম্যাকআর্থারের সহযোগিতায় সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সেই বৈরিতা অনুসরণ করিতেছেন। সুতরাং গোপন-চুক্তি ও রাজনৈতিক দর কষাকষির নিন্দা যুক্তির বিচারে সমর্থনীয় নহে।

কিন্তু এই সমস্তই বাহ্যিক লাভ-লোকসানের অতি সাধারণ হিসাব মাত্র। আসলে ১৯৪৫ সালের সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি এশিয়া মহাদেশে এক যুগান্তকারী ওলট-পালটের সম্ভাবনা সৃষ্টি করিল, যাহা অনেকেরই, এমন কি ইয়াল্টা-চুক্তির ইঙ্গ-মার্কিণ স্বাক্ষরকারীদের নিকটও বোধ হয় তেমন স্পষ্ট ছিল না; যদি থাকিত, তবে, তাঁহারা এভাবে সোভিয়েট কূটনীতির নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেন না। যদিও মহাযুদ্ধের অতি দ্রুত অবসান এবং মার্কিণ সৈন্যের অধিকতর ক্ষয় ও ক্ষতি নিবারণ ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষের প্রধান কাম্য ছিল, তথাপি মার্কিণ শাসক ও বণিকপুঞ্জের নিশ্চয়ই এই আশা ছিল যে, যুদ্ধের অবসানেও

চীনে চিয়াংকাইশেকের রাজত্ব অক্ষুণ্ণ এবং চীনের বাজার মার্কিণ মূলধন নিয়োগের জন্য পূর্বের মতই খোলা থাকিবে। ১৯৪৪ সালে একবার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট চিয়াংকাইশেকের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন, চীনের কমিউনিষ্ট সৈন্যসহ সমগ্র চীনা বাহিনীকে মার্কিণ সেনাপতি জেনারেল জোসেফ ষ্টিলওয়েলের পরিচালনাধীনে আনয়ন করিবার জন্য। কিন্তু চিয়াংকাইশেক তাহাতে রাজী হন নাই। ফলে জেনারেল ষ্টিলওয়েল সরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। সম্ভবতঃ ষ্টিলওয়েলকে এভাবে সরিয়া আসিতে না হইলে পরবর্তী-কালে চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে—অন্ততঃ জাপানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণের সময় আমেরিকার কিছুটা "সুবিধা" হইত। কিন্তু জাপান কতকটা আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিতভাবে আত্মসমর্পণ করিল। ফলে, চীন-মার্কিণ পরিকল্পনায় কিছুটা বিভ্রাট দেখা দিল। ওদিকে সোভিয়েট রাশিয়াকেও বেশীদিন লড়িতে হইল না। মাত্র চার-পাঁচ দিন যুদ্ধ করিয়াই মাঞ্চুরিয়ার স্নায়ুকেন্দ্রগুলি তাহাদের কবলে আসিয়া গেল!

কিন্তু রাশিয়া কেন এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল?—শুধু কি জারের আমলের কয়েক টুকরা জমি ও দ্বীপ উদ্ধারের জন্য?—না। রাশিয়ার ইহাতে প্রকাণ্ড স্বার্থ জড়িত ছিল। সেই স্বার্থ কেবল স্বকীয় ভৌগোলিক সীমানার নির্বিঘ্নতা রক্ষার মধ্যেই প্রতিফলিত হয় নাই, জাপানী সাম্রাজ্যবাদে বাধাদান ও চীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সহায়তার মধ্যেও ইহা বাস্তব রূপ ধারণ করিয়াছে। ১৯২২ সাল হইতেই রাশিয়া চীনের জাতীয় মুক্তি ও বৈপ্লবিক চেষ্টার প্রতি গভীর সহানুভূতি দেখাইয়া আসিয়াছে। কেবল সহানুভূতি নহে, হাতে-কলমে প্রভূত সাহায্যও দিয়াছে। ১৯১১-১২ সালে ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন মাঞ্চু রাজবংশের উচ্ছেদ ঘটাইয়া এশিয়ায় সর্বপ্রথম নূতন রিপাব্লিক রাষ্ট্রের পত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু রাশিয়ায় সোভিয়েট বিপ্লব ও কোমিণ্টার্ণ প্রতিষ্ঠার পর ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেনের কুওমিণ্টাং পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯২১ সালে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হইয়াছিল এবং ১৯২৪ সাল হইতে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত কুওমিণ্টাং ও কমিউনিষ্ট পার্টি একটি সম্মিলিত দল হিসাবে কাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন এলাকার রণ প্রভুদের (war-lord) উচ্ছেদ করিয়া জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা, বৈদেশিক প্রভুত্ব ও বিশেষ অধিকার এবং অসম সন্ধির অবসান—এক কথায় সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের চীন হইতে বহিষ্কার ও পূর্ণ রাষ্ট্রিক মর্যাদাসম্পন্ন ঐক্যবদ্ধ গভর্ণ-

মেণ্টের প্রতিষ্ঠা। কোমিণ্টার্ণ হইতে বহু সাহায্য দেওয়া হইল—বিবিধ প্রকারের "মাল" এবং "বিশেষ পরামর্শদাতা" পাঠানো হইল। বিখ্যাত বিপ্লবী বরোডিন, জেনারেল গ্যালেন—যিনি পরবর্তীকালে মার্শাল ব্লুচার নামে খ্যাত হইয়াছিলেন —ভারতীয় বিপ্লবী এম, এন, রায় প্রভৃতি এই সময় কোমিণ্টার্ণের প্রতিনিধিরূপে চীনে প্রেরিত হইয়াছিলেন চীনের বিপ্লবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। ১৯২৪ সালের জুন মাসে ক্যাণ্টনে যে মিলিটারী একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, উহার ডিরেক্টার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন জেনারেল চিয়াং কাইশেক। জেনারেল রুচারের নেতৃত্বে রুশ মিলিটারি মিশন নূতন সৈন্য ও অফিসারদের শিক্ষাদানে চিয়াং কাইশেককে সাহায্য করিতেছিলেন। জেনারেল চিয়াংয়ের ভাবী জাতীয়তাবাদী সৈন্যবাহিনী রাশিয়ার লাল ফৌজের আদর্শেই গড়িয়া উঠিতেছিল এবং চীনের ভবিষ্যৎ কমিউনিষ্ট গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠাতা মাও-সে-তুং, চৌ-এন-লাই, লিন-পো-চউ প্রভৃতিও গভর্ণমেণ্ট ও সৈন্যবাহিনীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিলেন ঃ

"The Comintern was able to send to China a remarkable group of political and military advisers, headed by Mikhail Borodin, one of the most brilliant and astute revolutionary organizers, and General Galen, who years later came to be better known as Marshal Blucher...Chiang Kai-Shek's future army of Nationalist Revolution was organized on the model of the Russian Red Army...Important Communist leaders of the future, such as Mao Tse-tung, Chou-Enlai, Lin Tsu-han (Lin Po-chin) etc., played important roles in the Government and in the army. These Communists helped to organize the masses, conduct propaganda and indoctrinate the officers and men of the army." ("Foreign Affairs"—1950, Oct., Hu Shih'-এর প্রবন্ধ)।

১৯২৫ সালের মার্চ মাসে ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন পরলোকগমন করেন এবং ১৯২৬ সালের জুন মাসে জেনারেল চিয়াংকাইশেক ক্যাণ্টন হইতে তাঁহার ঐতিহাসিক 'উত্তরমুখী অভিযান' সুরু করেন এবং ক্রমে কুওমিণ্টাংয়ের নেতারূপে চীনের সরকারী ক্ষমতা দখল করেন। ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে কুওমিণ্টাং ও কমিউনিষ্টদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিল ও শত্রুতার সুরু হইল। ১৮ই এপ্রিল,

১৯২৭, চিয়াং কাইশেক, নানকিংয়ে জাতীয়তাবাদী গভর্ণমেণ্ট গঠন ও প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং কমিউনিষ্টদিগকে নির্মম হস্তে দমন করিতে লাগিলেন। ১৯২৭ সালের শেষভাগে হুনান প্রদেশে প্রথম "সোভিয়েট" গঠিত হইল এবং ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে কিয়াংসি প্রদেশের জুইচিন সহরে চীনের "সোভিয়েট রিপাব্লিক" প্রতিষ্ঠিত হইল এবং মাও-সে-তুং উহার চেয়ারম্যান এবং চু-তে উহার প্রধান সেনাপতি নির্বাচিত হইলেন। উভয় পক্ষে সুরু হইল গৃহযুদ্ধ। ইতিমধ্যে ইউরোপে এবং রাশিয়ায় নূতন ফ্যাসিষ্ট উপদ্রব ও আক্রমণ ঘটিতে লাগিল। ১৯৩৫ সালের জুলাই-আগষ্ট মাসে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংঘ বা কোমিণ্টার্ণ কর্তৃক সপ্তম বিশ্ব-কংগ্রেসের অনুষ্ঠান হইল এবং ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে সম্মিলিত-ভাবে বাধাদানের জন্য "ইউনাইটেড ফ্রণ্ট" গঠনের আন্দোলন আরম্ভ হইল। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের পর ১৯৩৭ সালের জুন-জুলাই মাসে জাপান নূতন করিয়া উত্তর চীনে অভিযান সুরু করিল। তখন রাশিয়া ও চীন উভয়ের নিকট জাপানী সাম্রাজ্যবাদ নূতন বিপদের বার্তা বহন করিয়া আনিল এবং পুনরায় কুওমিণ্টাং-কমিউনিষ্ট মিলনের প্রয়োজনীয়তা উদ্ভূত হইল, নূতন রাজনৈতিক ভাষায় যাহার নাম ছিল ইউনাইটেড ফ্রণ্ট। উহার আগে আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। শেনসি প্রদেশের সিয়ান সহরে 'ইয়ং মার্শাল' চ্যাং সুয়ে-লিয়াং কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়িতে গিয়া তাহাদের সঙ্গে গোপন মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ১৯৩৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর তিনি সিয়ান সহরে আগত জেনারেল চিয়াং কাইশেককে হঠাৎ গ্রেপ্তার বা বন্দী করিলেন। চিয়াংয়ের জীবন বিপন্ন হইল। কিন্তু তিনি উদ্ধার পাইলেন কাহাদের দ্বারা?—কমিউনিষ্টরাই তাঁহাকে উদ্ধার করিল এবং প্রকাশ যে, মস্কোর নির্দেশেই ইহা ঘটিয়াছিল। কারণ, তখন জাপানকে বাধাদানই বড় কথা ছিল এবং বাধাদানের ব্যাপারে চিয়াংকাইশেকের সহযোগিতা অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইল। ইহার ফলে চিয়াংয়ের জীবন যেমন রক্ষা পাইল, তেমনই জাপানের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড ফ্রণ্ট গঠিত হইল। রাশিয়া এই সময় চীনের সঙ্গে একটি অনাক্রমণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করিল—১৯৩৭, আগষ্ট মাস। মস্কো ও নানকিংয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হইল। "বিশুদ্ধ খৃষ্টান" চিয়াং কাইশেক এভাবে ষ্ট্যালিনের এক বিস্ময়কর কূটনৈতিক চালের দ্বারা কমিউনিষ্ট বিরোধী হইতে সহযোগীতে রূপান্তরিত হইলেনঃ

"......this Puritan Christian was won over, probably for the first time in his life, by a masterful stroke of strategy. Of all things Stalin has ever done, that act came closest to statesmanship." —(পূর্বোক্ত পত্রিকার প্রবন্ধ)।

ইহার ফলে চীনা লাল ফৌজ ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অষ্টম রুট আর্মি নামে চীনের জাতীয় বাহিনীর অন্তর্গত হইল এবং জাপানের বিরুদ্ধে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সম্মিলিত প্রতিরোধ-যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

১৯৩৭ সালে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট যে কূটনৈতিক চালে চিয়াং কাইশেকের উপর বাজীমাৎ করিলেন এবং জাপবিরোধিতার ভূমিকায় কুওমিণ্টাং ও কমিউনিষ্ট-দিগকে একত্র করিলেন, ১৯৪৫ সালের ইয়াল্টা বৈঠকে মার্শাল ষ্ট্যালিন প্রেসিডেণ্ট রুজেভেল্টের নিকট জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়া আর একবার 'masterful stroke of strategy' দেখাইলেন। কারণ, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়া ষ্ট্যালিন নিশ্চিতরূপে দূরপ্রাচ্যসমস্যার দুইটি কঠিন প্রশ্নের এক সঙ্গে মীমাংসা করিতে চাহিলেন। যথা—(১) জাপানের পরাজয়ের পর একমাত্র আমেরিকাই যেন প্রশান্ত মহাসাগরে ও এশিয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বী রণপ্রভু ও অর্থনৈতিক প্রভু হইয়া বসিতে না পারে এবং (২) চীন মহাদেশে চিয়াংকাইশেক দীর্ঘকাল ধরিয়া যে গণতন্ত্র-বিরোধী ফ্যাসিষ্ট শাসন চালাইতেছেন এবং "গণ-বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা" করিয়া ক্রমাগত কমিউনিষ্টদিগকে ঠেঙ্গাইতেছেন, সেই প্রতিক্রিয়াশীল রাজত্ব আর কায়েম হইয়া বসিতে না পারে। প্রথম লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল এবং দ্বিতীয় লক্ষ্য পূরণের জন্য মস্কো গভর্ণমেণ্ট চুংকিং সরকারের সঙ্গে নূতন সামরিক মৈত্রী ও পারস্পরিক সাহায্যদানের এক প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

এই চাঞ্চল্যকর ভবিষ্যতের পরিণতি এবং ইউরোপে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সঙ্গে এশিয়া খণ্ডের 'গরম লড়াইয়ের' কিম্বা রাশিয়া ও আমেরিকার তীব্র সংঘাতের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমাদের দেশের রাজনৈতিক মহলে তেমন কোন চেতনা ছিল না। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতি-বিশারদ এম. এন. রয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই প্রকার উদ্বেগজনক পরিণতি সম্পর্কে বহু পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন, কিভাবে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপে রাশিয়ার প্রাধান্য লাভের চেষ্টা ও মার্শাল প্ল্যানের বিরোধিতার দ্বারা আমেরিকার "পাল্টা আক্রমণাত্মক অভিযান" (American counter-offensive) জোরালো এবং জয়যুক্ত হইবে—ফ্রান্স, ইতালী, গ্রীস ও তুরস্ক কেন আমেরিকার কর্তৃত্বে ও প্রভাবের মধ্যে চলিয়া যাইবে। আবার ইহারই প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ এশিয়াখণ্ডে রাশিয়া কিভাবে বাজীমাৎ করিবার চেষ্টা করিবে ট্রুম্যান ও চিয়াং কাইশেকের সহযোগিতার বিরুদ্ধে। ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসেই মনীষী রায় বলিলেন যে, মিত্রপক্ষের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চালাইতেছেন, সেই দলে চিয়াং কাইশেকের দলের যোগদান এই মহাযুদ্ধের একটা প্রকাণ্ড এবং উদ্ভট গোঁজামিল মাত্র।

"Chiang Kai-Shek's China in the camp of the United Nations has been one of the anomalies, indeed absurdities, of the war. Adversity might bring strange bed-fellows. But will the victory of Chiang Kai-Shek's China mean triumph of the cause of the United Nations on the Asiatic Front? Japan was going to be defeated, but what about the future of China? How should the civil war be concluded there? If the victory of the United Nations on the Asiatic front was to be celebrated in Chungking, then the war would have been fought in vain. Victory of Chiang-Kai-Shek's China would mean fascism in Asia surviving the defeat of Japan."

("The Russian Revolution")

অর্থাৎ জাপানের পরাজয়ের পর চিয়াং-কাইশেকের ফ্যাসিষ্ট রাজত্বই কি চীনে টিকিয়া থাকিবে? সেখানকার গৃহযুদ্ধেরই বা কিভাবে মীমাংসা হইবে? যদি চিয়াংয়ের চুংকিংয়ের রাজত্বই অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে, বুঝিতে হইবে মিত্র রাষ্ট্রপুঞ্জের এই মহাসংগ্রাম একান্ত ব্যর্থ গিয়াছে।

কিন্তু ষ্ট্যালিন ও সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া এই অবস্থাটা বিচার করিয়াছিলেন। চুংকিং গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি মিঃ টি ভি সুংয়ের মস্কোযাত্রা ও জাপানী যুদ্ধে রাশিয়ার যোগদানের প্রস্তাব লইয়া ষ্ট্যালিনের সঙ্গে আলোচনা এই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পথ রোধ করিল এবং চীন ও রাশিয়ার মধ্যে নূতনতর সামরিক মৈত্রী এশিয়ার ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণ নূতন পথে টানিয়া লইয়া গেল। "... 'the Soviet Union made it sure that Japan's defeat would not mean victory of Fascism in China." জাপানের পরাজয়ের দ্বারা চীনে যাহাতে ফ্যাসিজমের জয় প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে, সোভিয়েট ইউনিয়ন সে বিষয় নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট যেদিন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, সেদিনই ওয়াশিংটন হইতে "ইউনাইটেড প্রেস অব আমেরিকা" জানাইলেন—জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় রাশিয়ার যোগদানের দ্বারা এই যুদ্ধের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সূচনা করিতেছে এবং জাপানের দ্রুত পরাজয় আসন্ন করিয়া তুলিতেছে। কারণ,

বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করিতেছেন যে, কেবল সামরিক নহে, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া এবং পরিণতিও ইহা দ্বারা গুরুতর হইতে বাধ্য।..

"It is conceded here that Russia now must be given a leading role in the postwar reorganisation of Asia, and there is fear in some quarters that Russia may insist on the formation of pro-Soviet Governments in some countries of Asia, as they did in Eastern Europe". (পূর্বোক্ত গ্রন্থ)।

অর্থাৎ ভবিষ্যৎ এশিয়ার পুনর্গঠনে রাশিয়ার নেতৃত্ব যে মানিয়া লইতে হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেহ কেহ এমনও আশংকা করিতেছেন যে, পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েট পক্ষপাতী গভর্ণমেণ্টসমূহ গঠনে রাশিয়া যে দাবী জানাইয়াছিল, অনুরূপ দাবী এশিয়ার দেশগুলি সম্পর্কেও উঠিবে। যদি চীন মহাদেশে আমেরিকার বাণিজ্য, বাজার ও মূলধন আগের মতই নিরাপদ রাখিয়া এই যুদ্ধ শেষ করা যাইত, তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না। কিন্তু ষ্ট্যালিনের রাশিয়া সেই সম্ভাবনা মাটি করিয়া দিয়াছে। "মার্কিণ ধনপতি ও ব্যবসায়ীরাই ওয়াশিংটন গভর্ণমেণ্টের নীতি নির্দেশ করিয়া থাকেন" এবং তাঁহারাই দ্রুত যুদ্ধ জয়ের জন্য লালফৌজের সহযোগিতা চাহিয়াছিলেন। ফলে, এই মহাযুদ্ধের আর একটি প্রকাণ্ড গোঁজামিল দেখা দিল। কারণ—"Stalin naturally would not send the Red Army to make the Far East safe for American Imperialism or to drive the Japs out of China, so that the latter could welcome the American gallant".

মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদকে নিরাপদ করিবার জন্য কিম্বা জাপানের বিতাড়নের পর মার্কিণ যোদ্ধাদিগকে পুনরায় চীন দেশে ডাকিয়া আনিবার জন্য ষ্ট্যালিন নিশ্চয়ই তাঁহার লালফৌজকে রণক্ষেত্রে পাঠাইবেন না। "সুতরাং চীনকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গড়িয়া তুলিবার এবং সোভিয়েটের সঙ্গে নূতন মৈত্রী স্থাপনের দাবী রাশিয়ার পক্ষে উত্থিত হইবার কথা এবং ইহার ফলে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় রাশিয়ার যোগদানের দ্বারা চীনদেশে এক নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা! কারণ, জাপানী যুদ্ধ ও চীনের গৃহযুদ্ধ পাশাপাশিই চলিয়াছিল এবং তাহা দ্বারাই এই ভবিষ্যৎ পরিণতি সুনির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল।"

কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, জাপানের পরাজয়ের পর রাশিয়া এশিয়াখণ্ডে কোন নূতন যুদ্ধ চাহিয়াছে। বরং শান্তি ও নির্বিঘ্নতার সন্ধানই সে করিয়াছে—

যাহা নির্ভর করিতেছিল এক দিকে চিয়াংকাইশেক ও চীনা কমিউনিষ্টদের পারস্পারিক সম্পর্কের উপর এবং অন্য দিকে দূরপ্রাচ্যে মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতি ও রণনীতির উপর। মিঃ রায় মন্তব্য করিলেন—কূটনৈতিক অস্ত্র হিসাবে চীন-সোভিয়েট মৈত্রীর চুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাশিয়া চীনকে যে বিপুল পরিমাণ 'কনশেশন' দিয়াছে (যেমন মাঞ্চুরিয়ায় চীনের সার্বভৌম অধিকার, উত্তর চীনের রেলপথ ও বন্দরগুলির উপর চীনের অধিকার ও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি), তাহা সম্ভব হইত না যদি রাশিয়া কোন "প্রেষ্টিজের" প্রশ্নকে প্রাধান্য দিত। বরং সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট শান্তিপূর্ণ জগতে শান্তির সঙ্গে বাস করিতে চাহেন—এই আন্তরিকতার প্রমাণ তাঁহারা দিয়াছেন। "ইউরোপীয় যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবার পর সোভিয়েট কূটনীতি প্রাচ্য জগতের প্রতি মনোযোগ দিয়াছিল, সেখানে নির্বিঘ্নতার প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য। কিন্তু কিভাবে এই নির্বিঘ্নতা আসিবে, তাহা নির্ভর করিতেছে জাতীয়তাবাদী চীনের ভাবভঙ্গীর উপর।"

১৯২২ সাল হইতেই রাশিয়া চীনের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া আসিতেছিল চীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। ১৯৪৫ সালেও সেই লক্ষ্যই ছিল এবং ইহারই জন্য নূতন চীন-সোভিয়েট মৈত্রীর স্বাক্ষর। কারণ, ইহা রাশিয়ার নির্বিঘ্নতার পক্ষেও সবচেয়ে বড় গ্যারাণ্টি, আর ইহারই জন্য রাশিয়া বার বার চেষ্টা করিয়াছে।

"A democratic China would be a reliable ally of the Soviet Union and guarantee its security in the East. The object of Sino-Soviet treaty as far as Soviet diplomacy is concerned, is to detach China from reactionery outside influences, so that her internal life may be generally democratised. The Soviet Government has pledged itself not to interfere in the internal affairs of China; but only the political simpletons would believe that Moscow would render military and economic assistance to a re-actionary Chinese Government. The Russians would be fools if they repeated the bitter experience of 1925-26. The treaty, if faithfully implemented by the Chinese, is bound to serve the purpose of a powerful lever to revolutionise the internal life of China, and only a democratic China could escape the shameful position of an American vassal."—(পূর্বোক্ত গ্রন্থ)।

অর্থাৎ বাহিরের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির প্রভাব হইতে চীনকে বিচ্ছিন্ন করা এবং সেখানে আভ্যন্তরীণ জীবন মোটামুটি গণতন্ত্রের ভিত্তিতে গড়িয়া তোলাই চীন-সোভিয়েট সন্ধির উদ্দেশ্য। সোভিয়েট সরকার অবশ্যই চীনের আভ্যন্তরীণ জীবনে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, কিন্তু মস্কো চীনের প্রতিক্রিয়াশীল গভর্ণমেণ্টকে সামরিক বা আর্থিক সাহায্য দিবে, ইহা একমাত্র রাজনৈতিক বেকুবেরাই বিশ্বাস করিতে পারে। আর রুশরাও এমন মূর্খ নহেন যে, তাঁহারা ১৯২৫-২৬ সালের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করিবেন। সুতরাং এই সন্ধি যদি আন্তরিকতার সহিত পালিত হয়, তবে, চীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সহায়তা করা হইবে এবং এভাবেই আমেরিকার দাসত্ব স্বীকারের লজ্জাকর পরিণতি হইতে চীন রেহাই পাইতে পারে।

কিন্তু সোভিয়েট কূটনীতির এই দূরপ্রসারী লক্ষ্য অনুধাবন করিয়া ইতি-মধ্যে মার্কিণ নেতৃবৃন্দ শংকিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, সমগ্র চীন মার্কিণ প্রভাবের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। সুতরাং ওয়াশিংটনের কর্তৃপক্ষও সাবধানতা অবলম্বন করিলেন এবং তাঁহারা প্রধানতঃ তিন প্রকার কূটনৈতিক পন্থা অবলম্বন করিলেন। যথা—(১) পরাজিত জাপানকে সম্পূর্ণ অসম্মানিত ও ধ্বংস না করা। উহার কলকারখানার উৎপাদন শক্তি ও সমরশিল্প ও সামরিক শক্তি জীয়াইয়া রাখা এবং চীন হইতে যদি শেষ পর্যন্ত আমেরিকার উচ্ছেদ ঘটে, তবে, জাপানকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের কুক্ষিগত করিয়া রাখা। জাপানী প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে ম্যাকআর্থারের শাসন ও সহযোগিতার পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান করা। (২) প্রশান্ত মহাসমুদ্রের সমগ্র দ্বীপপুঞ্জে মার্কিণ নৌবহর, বিমানবহর ও সামরিক শক্তির ঘাঁটি এবং আধিপত্য বজায় রাখা—এক কথায় প্রশান্ত মহাসাগরকে "মার্কিণ হ্রদে" পারিণত করা এবং (৩) কমিউনিষ্টদের সঙ্গে গৃহযুদ্ধে এবং চীনের উপর কুওমিণ্টাং শাসন অব্যাহত রাখিবার জন্য যথাসম্ভব চিয়াং কাইশেকের গভর্ণমেণ্টকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া।

মার্কিণ সামরিকমহল ও কূটনৈতিকমহল এই পরিকল্পনা স্থির করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং এজন্যই বিনা সর্তে জাপানের আত্মসমর্পণ সত্ত্বেও জার্মাণীর অনুরূপ তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করা হইল না। কিন্তু এই নাটকের আসল মহড়া সুরু হইল তখন, যখন এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে জাপানী সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণের মুহূর্ত আসিল। চীন ও এশিয়ার ভূখণ্ডে যুদ্ধ চালাইবার পক্ষে জাপানের বৃহত্তম ঘাঁটি ছিল মাঞ্চুরিয়ায়—যাহার লোকসংখ্যা সাড়ে তিন কোটি

এবং যাহার আয়তন ৪ লক্ষ ১৩ হাজার বর্গ মাইল। এখানে জাপানের প্রভূত কলকারখানা ও শ্রমশিল্পের ঐশ্বর্য গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং এখানকার কোয়াণ্টাং আর্মিই জাপানের উৎকৃষ্টতম সৈন্যবাহিনীর অন্যতম। কিন্তু আকস্মিক যুদ্ধের অবসানের ফলে এই সমস্তই পড়িল সোভিয়েট রাশিয়ার হাতে—মাঞ্চুরিয়ার রেলপথ, মুকডেন, কিরিন, চাংচুন, পোর্ট আর্থারের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নৌ-ঘাঁটি এবং বিখ্যাত ডাইরেণ বন্দর ইত্যাদি রাশিয়ার দখলে চলিয়া গেল। এদিকে উত্তর-পশ্চিম চীনের কমিউনিষ্ট বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল চু-তে উত্তরবর্তী অঞ্চলের জাপানী বাহিনীর আত্মসমর্পণ গ্রহণের জন্য অগ্রসর হইলেন এবং উত্তর-পূর্ব প্রদেশগুলিতে প্রবেশের হুকুম দিলেন। সমস্ত জাপানী সমরসম্ভার ও সৈন্য এভাবে কমিউনিষ্ট বাহিনীর হাতে পড়িবে আশঙ্কা করিয়া জেনারেল চিয়াংকাইশেক চুংকিং হইতে হুকুম দিলেন যে, একমাত্র তাঁহার প্রতিনিধি ছাড়া আর কেহই চীন গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে জাপানের আত্মসমর্পণ গ্রহণের অধিকারী নহেন। তিনি জেনারেল চু-তেকে হুকুম দিলেন নিজের জায়গায় স্থির থাকিবার জন্য এবং পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করিতে। কিন্তু জেনারেল চু-তে এই হুকুম চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিলেন যে, চীনে জাপানী সৈন্যের শতকরা ৬৯ ভাগের বিরুদ্ধে একমাত্র কমিউনিষ্ট বাহিনীই লড়িয়াছে। সুতরাং জাপানীদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করার ন্যায় ও যুক্তি সংগত অধিকার তাঁহার আছে এবং সেই সংগে কমিউনিষ্ট অধিনায়ক একথাও জানাইলেন যে, তাঁহার বিনা সম্মতিতে কোন প্রকার চুক্তি, সর্ত বা সন্ধি করিলে, সেই সম্পর্কে "প্রশ্ন করিবার" অধিকার কমিউনিষ্টদের থাকিবে। এই বিতর্ক ও বিসদৃশ অবস্থার আলোচনার জন্য চিয়াংকাইশেক ইয়েনানের কমিউনিষ্ট গভর্ণমেণ্টের নায়ক মাও-সে-তুংকে চুংকিং যাইবার জন্য "আমন্ত্রণ" করিলেন। কিন্তু মাও-সে-তুং সেই "আমন্ত্রণ" অগ্রাহ্য করিলেন। চীনে মার্কিণ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়েড্‌মেয়ার এবং দূরপ্রাচ্য রণাংগনের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ম্যাকআর্থারও ঘোষণা করিলেন যে, চীনের বিভিন্ন অংশে জাপানীদের আত্মসমর্পণ গ্রহণের জন্য জেনারেল চিয়াংকাইশেকের প্রতিনিধিগণকে ভার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু চীনের কমিউনিষ্ট নায়কগণ ইহাতে ভুলিলেন না। ফলে, নূতন গৃহযুদ্ধের এক অনিবার্য ভূমিকা তৈয়ার হইল এবং সেই গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল অবিলম্বেই। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাস হইতে চীনা কমিউনিষ্ট বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ সুরু হইল জেনারেল চিয়াংকাইশেকের কুওমিণ্টাং বাহিনীর বিরুদ্ধে।

ইতিমধ্যে সোভিয়েট নীতি কি ভূমিকা গ্রহণ করিল? মাঞ্চুরিয়ায় সোভিয়েট বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মার্শাল ম্যালিনোভস্কি চীনা জাতীয় বাহিনীর হাতে কোন

কোন বন্দর ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন বটে, কিন্তু চিয়াং কাইশেকের সৈন্যদলের পৌঁছিবার আগেই চীনা কমিউনিষ্ট সৈন্যেরা আসিয়া পৌঁছিল এবং সোভিয়েট সেনাপতি তাহাদের হাতে বন্দরগুলি ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। অর্থাৎ রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, মাঞ্চুরিয়ায় সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এমন প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ কৌশল অবলম্বন করিলেন, যাহাতে মাঞ্চুরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বন্দর-গুলি কমিউনিষ্ট বাহিনী পূর্বাহ্ণে দখল করিবার সুযোগ পায়। জাপানের আত্মসমর্পণের তিন মাসের মধ্যে রাশিয়ার মাঞ্চুরিয়া ছাড়িয়া যাইবার কথা ছিল, কিন্তু ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাস শেষ হইবার আগে সোভিয়েট বাহিনী মাঞ্চুরিয়া হইতে প্রত্যাহৃত হইল না। অর্থাৎ সোভিয়েট বাহিনী ৯ মাসকাল মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া ছিল। কিন্তু এই সময়কার ইতিহাস এখনও কিছুটা ঝাপসা আছে। কারণ, আসলে দেখা যায় যে, ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসের আগে কমিউনিষ্ট চীনাবাহিনী মাঞ্চুরিয়া দখল করিতে পারে নাই। অবশ্য মাঞ্চুরিয়া দখলের এক বৎসরের মধ্যেই—১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে—সমগ্র চীনদেশ কমিউনিষ্টদের দখলে চলিয়া গেল এবং মাও-সে-তুং পিকিং হইতে কেন্দ্রীয় চীনা গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট গঠনের কথা ঘোষণা করিলেন। ৪৫ কোটি লোক অধ্যুষিত চীন মহাদেশের উপর নূতন কমিউনিষ্ট গভর্ণমেণ্ট এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, যাহা চীনের ইতিহাসে কোনদিন প্রত্যক্ষ করা যায় নাই। চিয়াং কাইশেক বহিষ্কৃত হইলেন চীন দেশ হইতে এবং তিনি ফরমোজা বা তাইওয়ান দ্বীপে আজও আশ্রয় লইয়া আছেন। সেই সঙ্গে চীন দেশ হইতে আমেরিকার সামরিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যও লুপ্ত হইল—বিগত ৫০ বৎসরের মার্কিণ প্রভুত্বের ইতিহাস চীন মহাদেশ হইতে মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে মুছিয়া গেল। ১৯৪৫ সালের ইয়াল্টা-চুক্তি এবং চুংকিং-মস্কো মৈত্রী এভাবে এশিয়ার চীনা ভূভাগ হইতে চিয়াং কাইশেক ও ট্রুম্যানের উচ্ছেদ ঘটাইল এবং রাশিয়ার বহুপ্রার্থিত "চীনা গণতন্ত্রের" প্রতিষ্ঠা করিল। আর জাপান তো "বিনা সর্তে" ধরাশায়ী হইল বটেই! সুতরাং দেখা যাইতেছে, কূটনীতি-বিশারদ ষ্ট্যালিন সোভিয়েট পররাষ্ট্রীয় নীতিকে এশিয়াখণ্ডে যেভাবে জয়যুক্ত করিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত কদাচিৎ পাওয়া যায়। এত অল্প মূল্যে এত বৃহৎ জয়, অতুলনীয় সন্দেহ নাই।

* * *

কিন্তু যুদ্ধোত্তর ইউরোপের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সঙ্গে এশিয়ায় সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের এই কূটনীতির জয় কেবল চীনা গৃহ-যুদ্ধের গরম লড়াইয়ের চরম মীমাংসা করিল না, ১৯৪৫-৪৯ সালের মধ্যে সঞ্চিত সোভিয়েট-মার্কিণ বিদ্বেষের

উক্তরূপ ১৯৫০ সালের ২৬শে জনুন কোরিয়া উপদ্বীপের ৩৮নং অক্ষরেখায় একেবারে বিস্ফোরণ ঘটাইল। চলতি দনুনিয়ার সমসাময়িক ইতিহাসের সংগে ইহা জড়িত এবং এই যনুদ্ধ এখনও অমীমাংসিত। গত ৯ মাসে ইহা সংবাদপত্রে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে, সনুতরাং এখানে ইহার বর্ণনা অনাবশ্যক। তবে, ইহার জটিলতা বনুঝাইবার জন্য কয়েকটি কথা উল্লেখ করা দরকার। কারণ, আমেরিকার নেতৃত্বে ইউ-এন-ও ঘোষণা করিয়াছেন যে, দক্ষিণ কোরিয়ার স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের উপর ২৬শে জনুন ভোর বেলা উত্তর কোরিয়ার কমিউনিষ্ট বাহিনীই প্রথম আক্রমণ চালাইয়া আন্তর্জাতিক আইন ভংগ করিয়াছে। সনুতরাং উত্তর কোরিয়া দণ্ডনীয়। অপর পক্ষে উত্তর কোরিয়া, চীন এবং সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ইহা অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, দক্ষিণ কোরিয়া গত এক বৎসর যাবৎ আমেরিকার চক্রান্তে একজোট হইয়া অনেকবার ৩৮নং অক্ষরেখা পার হইয়া হামলা করিয়াছে এবং ২৫শে জনুন এক নিয়মিত আক্রমণ চালাইয়াছে। উত্তর কোরিয়ার পাল্টা আক্রমণ উহারই জবাব মাত্র। এই ব্যাপারে আমেরিকা তথা ইউ-এন-ও'র হস্তক্ষেপ বে-আইনী। কারণ, (১) ইহা উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার গৃহযনুদ্ধ, সনুতরাং একান্তরূপে আভ্যন্তরীণ বিরোধ মাত্র; এবং (২) সিকিউরিটি কাউন্সিলের যে বৈঠকে উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল, সেই বৈঠকে সোভিয়েট রাশিয়া উপস্থিত ছিল না এবং কমিউনিষ্ট চীনকে ইউ-এন-ও'র সদস্যপদে গ্রহণ করা হয় নাই। সনুতরাং ইউ-এন-ও'র বিধান ও সনদ অনুসারে চীন ও রাশিয়ার বিনা সম্মতিতে গৃহীত এই প্রকার প্রস্তাব আইন-সম্মত হইতে পারে না। তথাপি সোভিয়েট রাশিয়া কোরিয়ার সমস্যা শান্তি-পূর্ণ উপায়ে মীমাংসার জন্য প্রস্তুত। ইহার প্রমাণ এই যে, কোরিয়ার যনুদ্ধের কয়েক দিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী শান্তিপূর্ণ উপায়ে কোরিয়া সমস্যার মীমাংসার জন্য ১৩ই জনুলাই তারিখ মার্শাল ষ্ট্যালিনের নিকট যে তারবার্তা পাঠাইয়াছিলেন, ষ্ট্যালিন ১৫ই জনুলাই উহার জবাব পাঠাইয়া নেহরুজীর প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। কিন্তু আজও সেই সমস্যার কোন মীমাংসা হইল না এবং ইতিমধ্যে চীন কোরিয়ার যনুদ্ধে "হস্তক্ষেপ" করিয়াছে। এই কমিউনিষ্ট চীনের সংগে সোভিয়েট রাশিয়া আবার পূর্ণতর মৈত্রীতে আবদ্ধ। অতএব আমেরিকার বিরুদ্ধে একটা ইউনাইটেড ফ্রণ্ট গড়িয়া উঠিবার কথা, যে ফ্রণ্ট গঠিত হইয়াছিল ১৯৩৭-৪৫ সালের জাপানের বিরুদ্ধে। কিন্তু পরাজিত জাপানের শাসক, বণিক ও সামরিক মহল এক্ষণে আমেরিকার দলভুক্ত, সেই আগেকার মার্কিণ-বৈরিতা আজ অবলুপ্ত। আবার ইন্দোচীন, ফিলিপাইন,

মালয়, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন কমিউনিষ্ট পার্টি সোভিয়েট রাশিয়ার দলভুক্ত। অতএব দূরপ্রাচ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতার নাটক অত্যন্ত রোমাঞ্চকর এবং এই নাটকের মর্মকেন্দ্রে রহিয়াছে মস্কো ও পিকিং। আর পিকিংয়ের মার্কিণ-বিদ্বেষ চীনের বিগত অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। আমেরিকার বিরুদ্ধে চীনের অভিযোগের অতি সাম্প্রতিক কাহিনীর কিছুটা উল্লেখ না করিলে এই আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হইবে না। কারণ, কোরিয়া, ফরমোজা ও পূর্ব এশিয়ার ভবিষ্যৎ হইতে ইহাকে পৃথক করা সম্ভব নহে।

গত ২৮শে নভেম্বর, ১৯৫০, ইউ-এন-ও'র সিকিউরিটি কাউন্সিলে ফরমোজা ও কোরিয়া সম্পর্কে আমেরিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিয়া কমিউনিষ্ট চীনের গণরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে মিঃ উ সিউ চুয়ান বলিয়াছিলেন যে, দীর্ঘকাল যাবৎ চীনদেশকে কুক্ষিগত করিয়া রাখার নীতিই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দূরপ্রাচ্যে অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। "১৯৪৫ সালে জাপানের আত্মসমর্পণের পর মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট মোট ১ লক্ষ ১৩ হাজার নৌ, বিমান ও স্থলসৈন্য চীনের বিভিন্ন বন্দরে ও রণনৈতিক বিন্দুতে সমাবেশ করিয়াছিলেন যাহাতে এই সৈন্যেরা চিয়াং কাইশেকের ১০ লক্ষ সৈন্যকে সম্ভাবিত গৃহযুদ্ধের রণাঙ্গনগুলিতে পাঠাইবার জন্য সহায়তা করিতে পারে। ১৭২০টি বিমান এবং ৭৫৭টি বিভিন্ন প্রকারের জলযানও চিয়াং কাইশেককে দেওয়া হইয়াছিল এবং চিয়াংয়ের ১৬৬ ডিভিসন সৈন্যকে রণসজ্জার দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছিল। এই মোট সাহায্যের পরিমাণ হইবে ৬০০ কোটি ডলার, যদিও মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট সরকারীভাবে মাত্র ২০০ কোটি ডলারের কথা স্বীকার করিয়াছেন। চিয়াং কাইশেকের অনুসৃত শোণিতস্রাবী গৃহযুদ্ধের সময় মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট এক হাজার সামরিক উপদেষ্টা চিয়াংয়ের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া মার্কিণ সৈন্যরা নানাভাবে চীনের গৃহযুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করিয়াছে এবং অন্ততঃ ৪০ বার কমিউনিষ্ট অধিকৃত এলাকাগুলি আক্রমণ করিয়াছে। এই সময় মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট ও কুওমিণ্টাং সরকারের মধ্যে বহু প্রকারের চুক্তি, সর্ত ও সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, যাহার ফলে চীন আমেরিকার একটি উপনিবেশে পরিণত হইয়াছিল:

"The monopoly capitalists of the United States, through the four big families of Chiang, Soong, Kung and Chen, controlled the life-stream of China's economy. In fact, the Chiang Kai-Shek KMT reactionary regime was nothing more than a puppet whereby American imperialists controlled

China. ......The Chinese people will never forget their blood-debt against the American imperialists". (নয়াদিল্লীর চীনা দূতাবাস হইতে প্রকাশিত ইংরাজী বক্তৃতার ১৬-১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

আমেরিকার বিরুদ্ধে চীনের মনোভাব কিরূপ গভীর অসন্তোষ ও বিদ্বেষে পূর্ণ, তাহা উপরি-উদ্ধৃত বিবৃতির অংশ হইতে বুঝা যাইবে। সুতরাং এক পক্ষে চীন ও রাশিয়া এবং অন্য পক্ষে আমেরিকার মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা কি প্রকার অসম্ভবের পর্যায়ে গিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা অনুমেয়। গত এক শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ এশিয়াখণ্ডে যে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ চালাইয়াছে, উহারই অনিবার্য পরিণতিতে আজ বিদ্বেষের আগুন সবত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি এই সুযোগে যে দূরপ্রাচ্যে শক্ত হইয়া বসিবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

'বিপ্লবের রপ্তানী', কোমিণ্টার্ণ ও রাশিয়া

ইতিহাসের কি এক সন্ধিক্ষণে কার্ল মার্ক্স উচ্চারণ করিয়াছিলেন— "Workers of the World, Unite !", বা 'দুনিয়ার মজদুর, এক হও!' আর দেশে দেশে সেই বাণী ছড়াইয়া পড়িল অগ্নিগর্ভ মন্ত্রের মত—শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক প্রাণবন্ত শ্লোগানরূপে ইহা পৃথিবীব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনে নূতন সাড়া আনিল। কিন্তু ধনতান্ত্রিক জগৎ শঙ্কিত হইল। সোভিয়েট বিপ্লবে রাশিয়ার সমস্ত কায়েমী স্বার্থের উচ্ছেদ, ব্যক্তিগত ব্যবসায় ও মুনাফার লোপ, সমগ্র শিল্প-বাণিজ্য ও উৎপাদন রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, তৃতীয় আন্তর্জাতিক বা থার্ড ইণ্টারন্যাশন্যালের নূতনতর প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্নে ট্রট্স্কি-ষ্ট্যালিনের মতবিরোধ ইত্যাদি যুগান্তকারী ঘটনা স্বভাবতঃই ধনতন্ত্রবাদিগণের চিত্তে এক প্রকাণ্ড দুর্ভাবনার ছায়া বিস্তার করিল। সেই দুর্ভাবনা আজও বিন্দুমাত্র কমে নাই। সুতরাং রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্নে বার বার এই অভিযোগ করা হইতেছে যে, সোভিয়েট সাম্যবাদ আক্রমণশীল, দেশে দেশে ইহার জন্য ছলে-বলে-কৌশলে নানা প্রস্তুতি চলিতেছে। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ও রুশ কমিউনিষ্ট পার্টি ইহার প্রধান নায়ক, লাল-ফৌজের বিরাট সামরিক শক্তি ইহার অনুকূলে এবং এই আক্রমণশীল আন্তর্জাতিক সাম্যবাদকে

বাধা দেওয়ার জন্যই কিম্বা ইহার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই বিপুলতর সামরিক শক্তির প্রয়োজন। কারণ সশস্ত্র বলপ্রয়োগকে যুদ্ধের দ্বারাই ঠেকাইতে হইবে। সুতরাং রাশিয়ার সহিত সহযোগিতা ও দুনিয়ার শান্তিরক্ষা কিরূপে সম্ভব?

প্রকৃতপক্ষে 'লাল-সাম্রাজ্যবাদ' ও বিশ্ব-বিপ্লবের ভীতিই আজিকার আন্তর্জাতিক জগতে রাশিয়ার প্রতি অসদ্ভাবের সবচেয়ে বড় অজুহাতরূপে প্রচার করা হইতেছে। কিন্তু সোভিয়েট-পক্ষপাতিগণ বলিতেছেন যে, ইহা একান্তরূপে বিকৃত প্রচার। ইহা দ্বারা ধনতন্ত্রবাদিগণ তাহাদের প্রতারণামূলক শোষণ-ব্যবস্থাকে আড়াল করিতেছেন এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্ব-বিপ্লব ও যুদ্ধায়োজনের দুর্নাম দিয়া নিজেদের রণলিপ্সাকে গোপন করিতেছেন। কারণ, বিশ্ব-বিপ্লব বা যুদ্ধ, কোনটাই সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের লক্ষ্য নহে। আর এই প্রশ্নটিও অত্যন্ত পুরাতন। অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর আগেও এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। সেই সময় পোল্যাণ্ডের গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে গিয়া নিজেদের জনগণকে এই বলিয়া ধাপ্পা দেন যে, বলশেভিকরা সসৈন্যে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়া জোরপূর্বক পোল নর-নারীর উপর কমিউনিজম চাপাইয়া দিবে। তখন সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট পোল্যাণ্ডের জনগণের উদ্দেশে এক ঘোষণায় প্রচার করেন, যাহার একাংশ এইরূপঃ—

"Your enemies, who are ours, speak falsely when they tell you that the Russian Government intends to force Communism on the Polish people with the help of the bayonets of the Red Army. Communism is only possible in countries where the vast majority of the working people have the will to secure it by their own initiative. Only then is a lasting Communist State possible, for then only can a Communist policy take deep root in a country. The Russian Communists are only endeavouring to defend their own land and their own peaceful work of organisation. They have no intention of establishing Communism in other countries by force......"
—('Russia—Friend or Foe ?' by Pat Sloan).

অর্থাৎ পোল্যাণ্ডের শাসকবর্গ, যাঁহারা রুশ ও পোল উভয় জনগণেরই শত্রু, তাঁহারা এই মিথ্যা প্রচার করিতেছেন যে, লালফৌজ তাহাদের সঙ্গীনের

মুখে পোল্যাণ্ডের উপর কমিউনিজম চাপাইয়া দিবে। কমিউনিজম একমাত্র সেই সমস্ত দেশেই সম্ভব যেখানে শ্রমিক জনসাধারণের অধিকাংশই নিজেদের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও উদ্যমের দ্বারা উহা পাইতে চাহে। একমাত্র তখনই কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব; কারণ, একমাত্র সেই অবস্থাতেই কমিউনিষ্ট নীতি কোনও দেশের বহুদূর গভীরে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। রুশ কমিউনিষ্টগণ কেবলমাত্র নিজেদের দেশকে রক্ষার জন্য এবং নিজেদের শান্তিপূর্ণ সংগঠনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। বলপূর্বক অন্য কোন দেশে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করার কোন ইচ্ছা তাঁহাদের নাই।

১৯২০ সালে লেনিনের ব্যক্তিগত নেতৃত্বে সোভিয়েট সরকার এই ঘোষণা দিয়াছিলেন, যাহার সোজা অর্থ—রাশিয়া জোরপূর্বক অন্য কোন দেশে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করিবে না। প্রত্যেক দেশেরই জনসাধারণের উপর উহা নির্ভর করিতেছে মাত্র। লেনিনের এই নির্দেশ আজও অব্যাহত আছে এবং এই নির্দেশের ১৬ বৎসর পর জনৈক মার্কিণ সাংবাদিক মঃ ষ্ট্যালিনকে রাশিয়ার চতুষ্পার্শ্বস্থিত রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে অনুরূপ প্রশ্ন করিলে, তিনি জবাব দেন—

"If you think that the Soviet people want to change the face of the surrounding States, and by forcible means at that, you are entirely mistaken. Of course, the Soviet people would like to see the face of the surrounding States changed, but that is the business of the surrounding States. I fail to see what danger the surrounding States can perceive in the ideas of the Soviet people if these States are really sitting firmly in the saddle."—(পূর্বোক্ত গ্রন্থ)।

অর্থাৎ রাশিয়ার চতুষ্পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির চেহারা সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট জোরপূর্বক বদলাইয়া দিবে, এমন কোন ইচ্ছা রাশিয়ার নাই—রাশিয়া সম্পর্কে তেমন চিন্তাও ভ্রমাত্মক। রাজ্যগুলি যদি নিজেদের গদীতে নিজেরা শক্ত হইয়া বসিয়া থাকে, তবে, সোভিয়েট জনগণের চিন্তাধারার জন্যই বা ভয়ের কি কারণ আছে?

ইহার পর মার্কিণ সাংবাদিক প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, বিশ্ব-বিপ্লব ঘটাইবার জন্য রাশিয়ার কোন ইচ্ছা বা প্ল্যান্ আছে কি না? উত্তরে ষ্ট্যালিন বলিয়াছিলেন:—

"You see, we Marxists believe that a revolution will also take place in other countries. But it will take place only when the revolutionaries in these countries think it possible, or necessary. The export of revolution is nonsense."

সোজা কথায়, মার্ক্সবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, অন্যান্য দেশেও বিপ্লব ঘটিবে, কিন্তু ইহা ঘটিবে তখনই যখন সেই সমস্ত দেশের বিপ্লবীরা উহা সম্ভব বা প্রয়োজন বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু 'বিপ্লবের রপ্তানী' নিতান্তই বাজে কথা মাত্র। ষ্ট্যালিনের শেষের কথাটি সমসাময়িক ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।— 'The export of revolution is nonsense!' অর্থাৎ বিপ্লবের রপ্তানী সম্ভব নয়, কারণ, উহা পণ্যদ্রব্য নয়! তথাপি অনবরত আমরা অভিযোগ শুনিতেছি যে, মস্কো হইতে গোপনে অন্যান্য দেশে বিপ্লবের চালান হইতেছে এবং সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি কৌশলে এই চালানি কার্যে সহায়তা করিতেছে। কিন্তু এই সমস্তই প্রচারকার্য মাত্র। কারণ, রাশিয়া যুদ্ধের দ্বারা কিম্বা সৈন্য পাঠাইয়া কোন দেশেই সাম্যবাদীয় বিপ্লব চাপাইয়া দেয় নাই। ১৯৩৭ সালের মে মাসে এই প্রশ্নটিরই আবার জবাব দিয়াছিলেন তদানীন্তন রুশ পররাষ্ট্রসচিব মঃ লিটভিনোফ লীগ অব নেশান্স বা বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের এক কাউন্সিল বৈঠকে। তিনি বলিয়াছিলেন, "যে গভর্ণমেণ্টের আমি প্রতিনিধি, তাহাদের একটা মতবাদ বা ideology আছে সন্দেহ নাই, এবং অন্যান্য দেশ যদি এই মতবাদে অনুপ্রাণিত হয়, তবে আমরা সুখী হইব বটে, কিন্তু সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট জোরপূর্বক ত' দূরের কথা, কোনভাবেই অন্য কোন দেশের উপর এই মতবাদ কখনও প্রয়োগ করে নাই এবং করিবেও না।"—আরও পরিষ্কার করিয়া বলা যায় যে, এইভাবে বিশ্ব-বিপ্লব ঘটাইবার কোন উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা সোভিয়েট রাশিয়ার নাই। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, রাশিয়া কি তবে বিপ্লবের বিরোধী, কিম্বা আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রবাদে সে কি বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছে? ইহার সোজা জবাব,—না। ষ্ট্যালিন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মার্ক্সবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, অন্যান্য দেশেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটিবে। কারণ, ধনতন্ত্রবাদ আপন স্ববিরোধিতার জন্যই টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। অবশ্য ইহার বিভিন্ন পর্যায় রহিয়াছে এবং তাহা অবিলম্বেই হইতেছে না! কিন্তু রাশিয়া একথা বিশ্বাস করে যে, পৃথিবী হইতে যুদ্ধ-নিবারণ ও শান্তি-রক্ষার জন্য এবং মনুষ্যজাতির সর্বোত্তম কল্যাণের জন্য সমাজতন্ত্রবাদই সর্বাপেক্ষা বড় গ্যারাণ্টি। এমন কি সমাজতন্ত্রবাদের চূড়ান্ত জয় ছাড়া রাশিয়ারও নির্বিঘ্নতা

সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কারণ, ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ অপরের সম্পদ শোষণ, লুণ্ঠন, রাজ্যবিস্তার এবং যুদ্ধের দ্বারা উপনিবেশ দখল ও বাজার সৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ফলে, এই ধনতন্ত্রবাদ পৃথিবীর শান্তি ও সমৃদ্ধির পক্ষে বিপজ্জনক। প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শাসন অব্যাহত রাখার কিম্বা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ইহা বার বার চেষ্টা করিবে, সুতরাং সমাজতন্ত্রবাদের চূড়ান্ত জয়ই কাম্য। ১৯৩৮ সালে ষ্ট্যালিন এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "Leninism teaches us that the final victory of Socialism, in the sense of full guarantee against the restoration of bourgeois relations is possible only on an international scale."

'লেনিনইজম্' আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিতেছে যে, বুর্জোয়া শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ গ্যারান্টি হিসাবে সমাজতন্ত্রবাদের পূর্ণ জয়লাভ একমাত্র আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতেই সম্ভব। অতএব আন্তর্জাতিকভাবে সমাজ-তন্ত্রবাদের চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা ছাড়া রাশিয়াও নিঃশঙ্ক হইতে পারে না। তথাপি রাশিয়া বিশ্ব-বিপ্লবের দাবাগ্নি জ্বালাইতেছে না। ইহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া জনৈক লেখক বলিতেছেন :

"The Soviet view is that world Socialism is the only final guarantee of peace. But since the Soviet conception of Socialism is a system which must of its very nature be built up by the organised action of the working people themselves in the different countries, and since an armed invasion of any kind would be likely to antagonise these working people and simply play into the hands of their opponents' propaganda about 'red imperialism', the possibility of the Soviet Government trying to introduce socialism elsewhere by armed invasion, as Fascism is inflicted by one State on the people of another country, is ruled out." (Pat Sloan'এর মন্তব্য, "Russia—Friend or Foe ?" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।) আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্র-বাদই শান্তিরক্ষার সর্বোত্তম উপায় বলিয়া বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও কেন রাশিয়া যুদ্ধের দ্বারা ইহা অন্য দেশে প্রতিষ্ঠা করিতে যাইবে না, তাহা এই উদ্ধৃতি হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

যদি 'বিপ্লবের রপ্তানী' একটা বাজে কথা হইয়া থাকে এবং বলপূর্বক

আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা দেওয়াও রাশিয়ার উদ্দেশ্য না হইয়া থাকে, তবে থার্ড ইণ্টারন্যাশন্যাল বা তৃতীয় আন্তর্জাতিক কিম্বা কোমিণ্টার্ণের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল কেন ? এবং কেনই বা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ষ্ট্যালিন উহা বাতিল করিয়া দিলেন ? কিম্বা নূতনতর কোমিনফর্মেরই বা উদ্দেশ্য কি ?—এই প্রশ্নগুলি উঠিবে।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদের উদ্গাতা কার্ল মার্ক্স, ফ্রেডারিক এংগেলস প্রভৃতি এই আন্তর্জাতিক আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন ঊনবিংশ শতকের মধ্য-ভাগে, যখন ইতিহাসবিখ্যাত "Communist Manifesto" প্রচারিত এবং উহারই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতি বা 'International Association of Workers' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের ধারা অনুসরণ করিয়া ঊনবিংশ শতকের ইউরোপে যেমন জাতীয় রাষ্ট্র বা ন্যাশন্যাল ষ্টেটগুলি গড়িয়া উঠিতেছিল গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা দাবীর পতাকাতলে, তেমনই নূতন উদীয়মান পুঁজিবাদী শ্রেণীসমূহ বা ধনতান্ত্রিক শক্তিসমূহ এই সমস্ত রাষ্ট্রের পুরোভাগে আসিয়া পড়িতেছিলেন শ্রমশিল্পের উৎপাদন-ব্যবস্থাগুলি করায়ত্ত করিয়া। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চূর্ণ করিয়া তখন নূতন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি অগ্রসর হইতেছিল এবং কার্যতঃ এই ধনিকশ্রেণীই রাষ্ট্র শাসন ও পরিচালনের ক্ষমতা দখল করিতেছিলেন। কারণ, সমাজের অধিকাংশ লোক—কেবল শ্রমিক ও কৃষকই নহে—নিজেদের জীবিকা ও রুটি অর্জনের জন্য শ্রমশিল্পের ও কলকারখানার এই ব্যাপক উৎপাদন (mass production) এবং সেই উৎপাদনের মালিকদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছিল। অথচ মাল, মুনাফা ও মূলধনের আসলে সৃষ্টি করিতেছিল শ্রমজীবী সাধারণ এবং এই সমগ্র ব্যবস্থার উপর তাহাদের কোন স্বামিত্ব বা স্বত্ব ছিল না। এদিকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও পুঁজিবাদের উপর দণ্ডায়মান জাতীয় রাষ্ট্রগুলি পৃথিবীর সর্বত্র একই চেহারা, চরিত্র ও সংগঠনের অন্তর্গত ছিল এবং একই বিধি-বিধানের দ্বারা এগুলি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতেছিল। সুতরাং পৃথিবীর সর্বত্র শ্রমজীবী সম্প্রদায়ও আবার এই একই শোষণ-ব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল। অতএব এই ব্যবস্থার সঙ্গে লড়িতে হইলে কিম্বা ইহার পরি-বর্তন ঘটাইতে হইলে একটা "আন্তর্জাতিক সামাজিক নব বিধানের" প্রয়োজন। কারণ, কার্ল মার্ক্স দেখাইলেন যে, যাহারা উৎপাদনকারী জনসাধারণ, তাহারা পুঁজিবাদের ফলে স্বত্ব, স্বামিত্ব ও স্বাধিকার হারাইয়া ফেলে। অর্থাৎ, তাহারা নিজেদের দেশের নিজেরা মালিক হইতে পারে না। সুতরাং এই

শোষিত জনগণের "স্বদেশ" বলিয়া কোন বস্তু থাকিতে পারে না। বরং জাতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয়তার ফলে এক দেশের শ্রমিকসাধারণ অন্য দেশের শ্রমিকদের বিরুদ্ধে লড়িতে বাধ্য। অথচ পৃথিবীব্যাপী শোষণ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়িতে হইলে অনুরূপ ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত সংগ্রাম-প্রচেষ্টার প্রয়োজন। ইহারই ফলে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে শ্রমিক আন্দোলনের উদ্যোক্তাগণ আন্তর্জাতিকতার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম আন্তর্জাতিকের উদ্ভবও হইয়াছিল এজন্য।

"Karl Marx showed that capitalism expropriated the producing masses. How could they be the owners of their respective countries? Therefore, Marx declared that the working class had no country. Nationalism would make the working class of one country fight the working class of another, while the interests of the working class, immediate as well as remote, required united efforts against the universal system of exploitation. That analysis of the situation, as it was in the middle of the nineteenth century, led the pioneers of the labour movement towards the ideal of internationalism. The International Association of Workers, subsequently known as the First International, was founded in consequence".—(M. N. Roy).

ঠিক এই কারণেই কার্ল মার্ক্স 'দুনিয়ার মজদুর, এক হও'—এই উদ্দীপনাপূর্ণ শ্লোগান প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার পর ইতিহাসের বহু যুগান্তকারী অধ্যায় অতিক্রম করিয়া এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্লামেন্টারী সংস্কারমূলক মনোভাবকে পিছনে ফেলিয়া তৃতীয় আন্তর্জাতিকের (কমিউনিষ্ট ইণ্টারন্যাশন্যাল) উদ্ভব হইল রাশিয়ায় সোভিয়েট বিপ্লবের পর ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে এবং কোমিন্টার্ণের প্রধান দপ্তরও প্রতিষ্ঠিত হইল মস্কোতে। বিভিন্ন দেশের ৬০টিরও অধিক কমিউনিষ্ট পার্টি ইহার অন্তর্গত ছিল এবং যদিও বিভিন্ন দেশের "মেহনতি জনতাকে" সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এবং আবশ্যকমত সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের দ্বারা বিপ্লব ঘটানোই ইহার উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি কোন দেশেই রাশিয়ার অনুকরণে বিপ্লব ঘটিল না কিম্বা ঘটানো সম্ভব হইল না। কিন্তু ইহারই সঙ্গে এক বিভ্রান্তিকর দৃশ্যের অবতারণা হইল। কোমিন্টার্ণের প্রধান শিবির মস্কোতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং একমাত্র রাশিয়ায় কমিউনিষ্ট পার্টিই "বিজয়ী পার্টি" হওয়ায় কিম্বা একমাত্র রাশিয়াতেই সোভিয়েট বিপ্লব ও সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট

প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কোমিণ্টার্ণের নীতি ও পদ্ধতি সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের নীতি ও পদ্ধতির সংগে এক বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। মার্ক্সীয় মূলনীতি অনুসরণের দাবী অনুসারেও ইহা ভিন্নরূপ হওয়া কঠিন ছিল। বিশেষতঃ সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি এই আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংঘের নীতির সংগে এক ও অবিভাজ্য বলিয়া প্রচারিত ও বিবেচিত হইতে লাগিল। কোমিণ্টার্ণের আভ্যন্তরীণ সংগঠন, সোভিয়েট রাশিয়ার আধিপত্য এবং বিভিন্ন কমিউনিষ্ট পার্টির মস্কোর প্রতি একান্ত আনুগত্যের জন্য স্বভাবতঃই রাশিয়ার বিরুদ্ধে পৃথিবীর সর্বত্র "বিশ্ববিপ্লব ঘটাইবার চক্রান্ত" আবিষ্কার কিম্বা তেমন প্রোপাগ্যান্ডা হইতে লাগিল। কিন্তু ইতিমধ্যে পৃথিবীর রাজনৈতিক চেহারার পরিবর্তন হইতেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালের মধ্যে ফ্যাসিজম এবং উহার আনুষঙ্গিক রাষ্ট্রিক ও সামাজিক শক্তিগুলি এক নূতন বিপর্যয়ের সূচনা করিতেছিল। আর রাশিয়ায় সুরু হইল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও শক্তিসঞ্চয়ের যুগ—বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়া—এবং "বিশ্ববিপ্লবের" উগ্রপন্থী ট্রট্স্কি দলের পতন ও বাস্তববাদী ষ্ট্যালিনের মতবাদ ও কর্মপদ্ধতির জয় প্রতিষ্ঠিত হইল। "Socialism in a single state" —এই তত্ত্ব রাশিয়ায় বাস্তব মূর্তি গ্রহণ করিতে লাগিল। সুতরাং রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি শান্তি ও নির্বিঘ্নতার সন্ধানে পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক শক্তিবর্গের সংগে "পাশাপাশি বাস" করিবার জন্য সচেষ্ট হইল। আর ফ্যাসিজমের অগ্রগতির বিরুদ্ধে লড়িবার এবং বিভিন্ন দেশের শ্রমজীবী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির আত্মরক্ষার জন্য কোমিণ্টার্ণের মারফৎ 'পপুলার ফ্রণ্ট', 'ইউনাইটেড ফ্রণ্ট' ইত্যাদি শ্লোগান চালু হইল—যাহা ত্রিংশ দশকের ফ্রান্সে, স্পেনে ও চীনে ইতিহাসের এক বিচিত্র অধ্যায়ের সৃষ্টি করিল। পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও ইহার জোয়ার দেখা দিল, কিন্তু কোমিণ্টার্ণের এই নূতন আন্দোলন বিশ্ববিপ্লবের ভীতি ও রাশিয়ার প্রতি অবিশ্বাস দূর না করিয়া বরং সন্দেহ বাড়াইয়া তুলিল। ফলে, রাশিয়ার অনাক্রমণ চুক্তি ও সমষ্টিগত নিরাপত্তার দাবী ইত্যাদি কিছুই টিকিল না এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইল। তখন ১৯৪৩ সালের মে মাসে মস্কো হইতে তৃতীয় আন্তর্জাতিক বা কোমিণ্টার্ণের অবসান ঘোষণা করা হইল—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মহামৈত্রীর অন্যতম উপায় হিসাবে যখন পৃথিবী হইতে ফ্যাসিষ্ট শক্তির অপসারণই সব চেয়ে জরুরী এবং বড় লক্ষ্য বলিয়া সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট উপলব্ধি করিলেন। সেই সময় ষ্ট্যালিন 'রয়টারের' প্রতিনিধির প্রশ্নের জবাবে অন্যান্য কথার মধ্যে

বলিয়াছিলেন—

"The dissolution of the Communist International is proper and timely, because it facilitates the organization of the common onslaught of all freedom-loving nations against the common enemy—'Hitlerism'...it exposes the calumny of the adversaries of Communism within the labour movement to the effect that Communist parties in various countries are allegedly acting not in the interest of their people but on orders from outside. An end is now being put to this calumny too......"

ষ্ট্যালিনের এই বিবৃতিতেও দেখা যায় যে, কোমিণ্টার্ণের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক জগতে ভীতি ও অবিশ্বাস ছিল, যাহা সোভিয়েট সহযোগিতার পথে বিঘ্নস্বরূপ ছিল। কিন্তু ১৯৪৩ সালে যে আন্তর্জাতিক সংঘের অবলুপ্তি ঘটিল, তাহাই কি আবার 'কোমিনফর্মের' মারফৎ পুনরুজ্জীবিত হইল?—না, অন্ততঃ কমিউনিষ্টরা অস্বীকার করিতেছেন। তাঁহাদের মতে, ইহা বিভিন্ন কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের ও মতামত আলোচনা করিবার একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র—কোন 'বাধ্যতা' বা 'নির্দেশ' ইহার মধ্যে নাই এবং সদস্যপদও নিতান্তই স্বেচ্ছামূলক।

"There is, of course, no longer an International and the Communist Information Bureau, formed last year, is what its name implies : a centre for the distribution of information to the working class movement in every country and a gathering place for exchanges of opinion between the Communist Parties which belong to it. But there is no 'direction', no 'compulsion'. Membership is entirely voluntary".—('The Case for Communism'—by W. Gallacher).

কিন্তু কোমিনফর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে এবং বিধি-বিধানের দিক দিয়া কোমিণ্টার্ণ বা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ভূমিকা গ্রহণ না করিলেও ইহা যে যুদ্ধোত্তর জগতে মার্কিণ আধিপত্যের এবং বিশেষভাবে ডলারতন্ত্র ও মার্শাল প্ল্যানের বিরোধিতা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা কঠিন। ইউরোপে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের একান্ত তীব্রতার সময় ১৯৪৯ সালে ফ্রান্স, ইতালী, বৃটেন ও

আমেরিকার কমিউনিষ্ট পার্টিসমূহ প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছিল যে, আবার যদি যুদ্ধ বাধে, তবে তাহারা সোভিয়েট রাশিয়ার দলে তো যাইবেই, এমন কি বিজয়ী লাল ফৌজকে স্বাগত জানাইবে। 'বিপ্লবাত্মক পরাজয়বাদ' বা 'revolutionary defeatism'-মতবাদের সমর্থক এই প্রকার বিবৃতি সেই সময় গভীর চাঞ্চল্য এবং শাসকগোষ্ঠীর তীব্র অসন্তোষ জাগাইয়াছিল।

তথাপি রাশিয়া যে অন্য দেশে 'বিপ্লবের রপ্তানী' করিতেছে না এবং লাল ফৌজের সাহায্যে সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা অন্য কোন রাষ্ট্রকে সাম্যবাদে দীক্ষা দিতেছে না, একথা সত্য। কারণ, রাশিয়া আজ পর্যন্ত অপরের কোন দেশ যুদ্ধের দ্বারা জয় ও দখল করে নাই। এমন কি মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তরের কোন কোন তীক্ষ্ম সমালোচক পর্যন্ত যুদ্ধোত্তর সংঘাত ও দ্বন্দ্বের কথা আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য নহে। কারণ, রাশিয়া যুদ্ধ চাহে না। ইহার একটা বড় কারণস্বরূপ বলা হইয়াছেঃ

"......the current Stalinist doctrine does not demand war. On the contrary, it also teaches that eventually capitalism will fall largely of its own weight, i.e., as a result of the inner 'contradictions' which the Communists believe it embodies. They see the role of Communism as one of hastening the collapse of capitalism and assisting, as a midwife, at the birth of the socialist order. In theory, they seem inclined to regard this as primarily the task of the native Communists in each country, and not of the Soviet Red Army". ['The Readers Digest', March, 1950, George F. Kennan লিখিত প্রবন্ধ 'Is war with Russia inevitable ?' দ্রষ্টব্য]

ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট রাশিয়া নিজ দেশের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন লইয়াই ব্যস্ত। সুতরাং যুদ্ধের ফ্যাসাদের মধ্যে যাওয়া কিম্বা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের সহযোগিতায় বিপ্লবের চালান দেওয়া তাহার উদ্দেশ্য নহে। এমন কি বলা যাইতে পারে যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রবর্তনের পর হইতেই এই ধরণের অবাস্তব চেষ্টা পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং মহাযুদ্ধের আগে এবং পরে ষ্ট্যালিন বার বার বলিয়াছেন যে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহিত শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান এবং সৌহার্দ্য বজায় রাখিয়া চলাই রাশিয়ার উদ্দেশ্য, তাহার পররাষ্ট্র নীতিও ইহা দ্বারা অনুপ্রাণিত। এমন কি, যে আমেরিকা এত তর্জন-গর্জন

করিতেছে, উহার সম্পর্কেও রাশিয়া শান্তিপূর্ণ মনোভাবই দেখাইতেছে এবং আমেরিকা ধনতন্ত্রবাদী দেশ হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়ার পক্ষে সহযোগিতা ও সদ্ভাব বজায় রাখা যে সম্ভব, ১৯৪৫ সালে মঃ ষ্ট্যালিন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে তাহা নিম্নলিখিত বার্তায় দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেনঃ—

"They—the Soviet Union and the United States—certainly can co-operate. The difference between them is of no essential importance as far as their co-operation is concerned. The economic systems in Germany and the U. S. A. are similar, and nevertheless war broke out between them. The economic systems of the U. S. A. and U. S. S. R. are different, and yet they did not fight each other but co-operated during the war. If the two different systems could co-operate during the war, why can they not co-operate in peace time? It is certainly understood that given a desire to co-operate, co-operation is perfectly possible even with different economic systems......" ('Problems of Foreign Policy'—by Molotov, p. 436).

ইহার পর বর্তমান ১৯৫১ সাল পর্যন্ত মঃ ষ্ট্যালিন তাঁহার এই মতবাদ ও মনোভাব নানা উপলক্ষে বহুবার ব্যক্ত করিয়াছেন, যাহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে প্রাক্তন কোমিণ্টার্ণের বিশ্ব-বিপ্লবের ভূত একটা ছায়ামূর্তি মাত্র।—অন্ততঃ রাশিয়ার দিক হইতে এই ভূত-চালানির কারবার ঘটিবে না।

উপসংহার—সমাজতন্ত্র ও পররাষ্ট্রনীতি

সোভিয়েট রাশিয়া দ্বিধাহীন চিত্তে শান্তিনীতির কথা বলিতে পারিতেছে কেন?—সে কি তাহার প্রভূত পরিমাণ রাষ্ট্রশক্তির জন্য? কিম্বা প্রকৃতির ঐশ্বর্যে, শ্রমশিল্পে এবং কলকারখানার উৎপাদন-সম্ভারে জগতের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া? —কিন্তু এদিক দিয়া আমেরিকাও তো ভাগ্যবান্—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তো ধনপতি ও শিল্পপতিদের রাজা! তথাপি আমেরিকা হইতে প্রতিদিন রণহুঙ্কার উঠিতেছে, প্রশান্ত মহাসমুদ্র ও অতলান্তিকের তীর-যুদ্ধের ডামাডোলে মুখরিত হইতেছে, আর রাশিয়া নেতৃত্ব করিতেছে শান্তি-কংগ্রেসের। ১৯৪৯ ও ১৯৫০

সালে সারা বৎসর ধরিয়া রাশিয়া কেবল আন্তর্জাতিক শান্তি ও যুদ্ধের বিরোধিতার আন্দোলন করিয়াছে। ইউ-এন-ও'র বৈঠকে, সংবাদপত্রে, প্রচার-পুস্তিকায় এবং বক্তৃতামঞ্চে সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবিগণ অনবরত পৃথিবীর শান্তি রক্ষার জন্য আন্দোলন করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এই আন্তর্জাতিক শান্তি-আন্দোলন দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে. যাহার ঢেউ ভারতবর্ষে পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে প্যারিসে ও প্রাগে শান্তি কংগ্রেসের প্রথম অনুষ্ঠানের পর ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল ওয়ারশতে। (বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট শেফিল্ডে ইহার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন)। ৮২টি দেশের দুই সহস্রাধিক ডেলিগেট পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের শান্তি রক্ষার প্রতিশ্রুতি লইয়া এই কংগ্রেসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আর সোভিয়েট-বিরোধী জগৎ ইহাকে বিদ্রূপ ও সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছেন! কেন এমন হয়? কেন এক পক্ষ যুদ্ধ এবং অপর পক্ষ শান্তির কথা বলেন?—সমাজতন্ত্রবাদ ও ধনতন্ত্রবাদের মূলনীতিগত বৈষম্যই ইহার পিছনে রহিয়াছে, যে বৈষম্য আবার উভয় পক্ষের পররাষ্ট্রীয় নীতিতে প্রতিফলিত।

"In the Manifesto of the Communist Party a hundred years ago, Marx and Engels, condemning the foreign policy of exploiter states, outlined the aims which the working class sets itself in the sphere of international relations. After pointing out that the bourgeoisie of every country is engaged in a continual struggle against the bourgeoisie of all other countries, the authors of the Manifesto said that establishment of the socialist order would fundamentally transform not only our relations between people inside a nation, but relations between nations too,

"In proportion as the exploitation of one individual by another is put an end to, the exploitation of one nation by another will also be put an end to.

"In proportion as the antagonism between classes within the nation vanishes, the hostility of one nation to another will come to an end." ('New Times', 17-3-48.)

অর্থাৎ, এক শতাব্দী পূর্বে প্রচারিত "কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে' মার্ক্স এবং এঙ্গেলস শোষক রাষ্ট্রগুলির পররাষ্ট্রনীতির নিন্দা করিয়া আন্তর্জাতিক জগতের

সম্পর্ক স্থাপনে শ্রমজীবী শ্রেণীর উদ্দেশ্য কি, তাহা নির্দেশ করিয়াছিলেন ঃ তাহাতে তাঁহারা দেখাইয়াছিলেন প্রত্যেক দেশের বুর্জোয়া কিভাবে অন্য দেশের বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রামে লিপ্ত আছে এবং তারপর তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে কেবল একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণের মধ্যেই সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তন ঘটিবে না বিভিন্ন জাতির মধ্যেও এই সম্পর্কের মূলনীতিগত পরিবর্তন ঘটিবে। তাঁহারা মন্তব্য করিয়াছিলেন ঃ—

'এক ব্যক্তি কর্তৃক অন্য ব্যক্তির শোষণ যে পরিমাণে কমিবে, ঠিক সেই পরিমাণেই এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতির শোষণও কমিবে।

'একটি জাতির অভ্যন্তরে শ্রেণীদ্বন্দ্বের বৈরিতা যে পরিমাণে লুপ্ত হইবে, ঠিক সেই পরিমাণেই এক জাতির বিরুদ্ধে অন্য জাতির বৈরিতারও অবসান হইবে।'

সোভিয়েট রাশিয়া ও কমিউনিজমের অনুগামিগণ দাবী করিতেছেন যে, ১০০ বৎসর আগে মার্ক্স ও এঙ্গেলস ধনিক রাষ্ট্র ও সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের মূলনীতিগত বৈষম্য যাহা বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছিলেন এবং এই উভয় প্রকার রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রীয় নীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছিলেন, সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ, সাম্রাজ্যবাদ, বাজার দখল ও যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য-বিস্তার—এগুলি সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মধ্যে নাই বলিয়া এবং এক শ্রেণী কর্তৃক আর এক শ্রেণীকে শোষণের অধিকার লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া এই পররাষ্ট্রনীতিও সমস্ত মানুষের শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং যুদ্ধের বিরোধিতা করিতে পারিতেছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেই এই পররাষ্ট্রীয় নীতির কল্যাণকর বীজ নিহিত রহিয়াছে। প্রাকৃতিক সম্পদে ভাগ্যবান্ এবং শক্তিশালী বৃহৎ দেশ বলিয়াই যে এই নীতি অনুসরণ রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব এমন নহে, (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও ত' তাহার মত শক্তিশালী ও ঐশ্বর্যশালী), প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার শোষণ, দারিদ্র্য এবং মানুষে মানুষে ও জাতিতে জাতিতে বৈষম্য লোপ পাইয়াছে বলিয়াই রাশিয়া ধনিক রাষ্ট্রসমূহের বিপরীত নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করিতে পারিতেছে। সোভিয়েট-পক্ষপাতিগণ রাশিয়ার মূলনীতি উদ্ঘাটন করিয়া বলিয়াছেন ঃ

"The key principles of Soviet foreign policy follow from the nature of the Soviet political and social order, which

precludes the exploitation of man by man and rejects all inequality between nations and races."—(পূর্বোক্ত পত্রিকা)

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করিয়াই সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতির মূল নীতিগুলি অনুসৃত হইতেছে এবং ইহার ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাশিয়া "লুকোচুরি, ধাপ্পাবাজী কিম্বা গোপনীয়তার"ও অবসান ঘটাইতে পারিয়াছে।

"In contradistinction to the imperialists, the Soviet Union seeks to have international relations conducted in broad daylight. Lenin stressed that the imperialists 'have an artistically elaborated system for duping the masses of the people in foreign affairs'. Soviet foreign policy has rendered a splendid historic service by steadfastly and consistently exposing the evasions, hypocrisy and deceptions practised by the diplomacy of imperialism."—(ঐ পত্রিকা)

সোজা কথায়, সোভিয়েট রাশিয়া তাহার পররাষ্ট্রীয় নীতি প্রকাশ্য দিবালোকেই পরিচালনা করিতে পারে, কোন গোপনীয়তার অন্ধকার দরকার করে না। লেনিন বলিয়াছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ পররাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রে জনগণকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্য এক সূক্ষ্ম শিল্পকলাসম্মত চতুর ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে! কিন্তু সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি সাম্রাজ্যবাদীয় কূটনীতির এই ধাপ্পাবাজী ও মুখোস খুলিয়া দিয়াছে।—ইহার স্বপক্ষে কমিউনিষ্টরা দাবী করিতেছেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী যুগ পর্যন্ত ধনিক রাষ্ট্রগোষ্ঠী ও সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রীয় নীতির তুলনামূলক বিচার করিলেই এই তথ্য ঐতিহাসিক সত্যের মত পরিষ্কার হইয়া যাইবে। গত বিশ বৎসরের আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে রাশিয়া যুদ্ধ ও পররাজ্য-আক্রমণের বিরোধিতা, শান্তি-স্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা, নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব-গ্রহণের চেষ্টা, ফ্যাসিজমের বিরোধিতা এবং আক্রান্ত ও পদানত জাতিগুলির উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যখন আমেরিকার নেতৃত্বে ধনিক রাষ্ট্রগুলি বৎসরের পর বৎসর সামরিক বাজেট বৃদ্ধি ও যুদ্ধায়োজনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে এবং জনসাধারণের নিত্য-ব্যবহার্য বস্তুর উৎপাদন কমাইয়া ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন ইত্যাদি তৈয়ার করিতেছে, তখন রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনে মন দিয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিণের পক্ষ হইতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে সমস্ত "মিথ্যা ও দুষ্ট প্রচারকার্য"

চলিতেছে, উহার জবাবে মার্শাল ষ্ট্যালিন গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী যে বিবৃতি দিয়াছিলেন (এই বিবৃতির অধিকাংশই 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত হইয়াছে), তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ১৯৪৬ সাল হইতে ১৯৪৮ সালের মধ্যে যুদ্ধের সময়ে গঠিত রাশিয়ার সমস্ত বাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেশরক্ষার বাজেট পুরাণো দিনের কোঠায় চলিয়া গিয়াছে। নূতন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রবর্তনের দ্বারা দেশের সর্বাঙ্গীণ বৈষয়িক উন্নতি ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ও নিত্যব্যবহার্য বস্তুর উৎপাদন-বৃদ্ধি ও মূল্য-হ্রাসের জন্য বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা অনুসরণ করা হইতেছে। ভল্গা নদী, নীপার নদী ও আমুডেরিয়া নদীতীরে জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের প্রকাণ্ড "রাক্ষুসে" কারখানা স্থাপন করা হইতেছে। ষ্ট্যালিন বিদ্রূপের ভঙ্গীতে এই সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে, অর্থনীতি সম্পর্কে যাঁহাদের বিন্দুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান আছে, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে এই সমস্ত জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনা প্রবর্তন ও অনুসরণ করা যায় না, যদি লক্ষ লক্ষ সৈন্যের বাহিনী গড়িতে কিম্বা বাজেটের কোটি কোটি টাকা যদি সমরায়োজনে ব্যয় করিতে হয়! আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্স ইত্যাদির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন যে, মুনাফা-অর্জনকারী প্রতিক্রিয়াশীল কোটি-পতিরা এই সমস্ত দেশের গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা করিতেছেন এবং যুদ্ধ ও অস্ত্র-ব্যবসায়ের কারবারীরা মোটা মুনাফার লোভে যুদ্ধের হুজুগ জীয়াইয়া সামরিক পণ্য উৎপাদনের কারখানাগুলিকে চালু করিয়াছেন। তাঁহারাই আবার রাশিয়ার শান্তিপূর্ণ নীতিকে বিকৃত করিয়া ও সাম্যবাদের জুজুর ভীতি দেখাইয়া জন-সাধারণকে ধাপ্পা দিতেছেন! নিরস্ত্রীকরণ (প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে প্রস্তাব রাশিয়া সর্বাগ্রে উত্থাপন করিয়াছিল), আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ কিম্বা কোরিয়া ও চীন সম্পর্কে যে-কোন শান্তি-প্রস্তাব উত্থাপন, অথবা বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্র হইতে সৈন্য-অপসারণ ইত্যাদি যে-কোন প্রস্তাব রাশিয়া ইউ-এন-ও'তে পেশ করিয়াছে, সেগুলি ইঙ্গ-মার্কিণের ভোটের জোরে অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। রাশিয়ার অভিযোগ এই যে, ইউ-এন-ও এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে "আমেরিকার পকেটস্থ", কারণ, অতলান্তিক চুক্তির অন্তর্গত ১০টি রাষ্ট্র এবং ২০টি ল্যাটিন আমেরিকান দেশ আমেরিকার নেতৃত্বে মেজরিটিতে পরিণত হইয়াছে। অতএব ইউ-এন-ও আন্তর্জাতিক বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের নৈতিক মর্যাদা ও অধিকার হারাইয়া এক্ষণে আক্রমণশীল ইঙ্গ-মার্কিণ গোষ্ঠীর যন্ত্রে মাত্র পরিণত হইয়াছে।.........

রাশিয়ায় মুনাফাশিকারী কোন ব্যবসায়ী-গোষ্ঠী ও শিল্পপতি নাই। সুতরাং বৃটেন বা আমেরিকা ইত্যাদি দেশগুলির অনুরূপ যুদ্ধ ও অস্ত্রের কারবারীরাও নাই।

ফলে, যুদ্ধের হুজুগ জীয়াইয়া রাখা কিম্বা অন্য দেশে অস্ত্র চালান দিয়া মোটা মুনাফা-অর্জনকারী রাশিয়াতে কেহ নাই। মানুষ-মারা ব্যবসায়ের এই পাপ হইতে সোভিয়েট-সমাজ মুক্ত।—(এই সম্পর্কে Pat Sloan প্রণীত 'Russia—Friend or Foe ?' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

অপর পক্ষে আমেরিকাতে এই প্রকার কারবার ও মুনাফা কেমন চলিতেছে তাহা মঃ ভিসিনস্কি গত ১২ই ডিসেম্বর (১৯৫০) ইউ-এন-ও'র বক্তৃতায় বিশদভাবে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এক একটি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী মার্কিণ কোম্পানী,—যেমন মর্গান পরিচালিত জেনারেল ইলেকট্রিক, দ্যু পণ্ট ভি নেমার, মনস্যাণ্টো কেমিক্যাল কোং, জেনারেল মোটরস্, ইউনাইটেড ষ্টিল কর্পোরেশন ইত্যাদি—১৯৪১ ও ১৯৫০ সালে ইনকাম ট্যাক্স বাদ দিয়া বহু শত কোটি টাকার মুনাফা অর্জন করিয়াছে, (২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫০, 'নিউ টাইমস্' পত্রিকার ক্রোড়পত্র দ্রষ্টব্য)। এজন্যই যুদ্ধবিরোধী, এমন কি এ্যাটম বোমা বিরোধী কোন প্রস্তাব আমেরিকা তথা ইউ-এন-ও গ্রহণ করিতেছে না।

রাশিয়ার আরও বক্তব্য এই যে, যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পর পৃথিবীর দুরবস্থা ও জনগণের বিপদের সুযোগে আমেরিকা এবং উহার ধনপতিগণ বহু সহস্র কোটি টাকার মুনাফা (যেমন একমাত্র স্বর্ণের দ্বারাই ১০০০ কোটি ডলার!) অর্জন করিয়াছে। অথচ উহারই সঙ্গে পাশাপাশি সামরিক বাজেট ও জনসাধারণের উপর কর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বেকার, অর্ধ-বেকার ইত্যাদির সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় দেড় কোটির মত! কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে সোভিয়েট রাশিয়াতে একজনও বেকার নহে,—দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইয়াছে, মুদ্রাস্ফীতি নিবারিত হইয়াছে, খাদ্যদ্রব্য ও জনগণের নিত্য-ব্যবহার্য বস্তুর উৎপাদন স্বচ্ছল হইয়াছে এবং মুনাফা-শিকারীর দল বহু পূর্বেই লোপ পাইয়াছে। যাহার শোষণ নাই, উপনিবেশ নাই, কাঁচামালের বাজার ও পরের দেশ দখলের প্রয়োজন নাই, সে কেন পররাষ্ট্রীয় নীতিতে কূটনৈতিক ধাপ্পাবাজী এবং যুদ্ধের চক্রান্ত ও অপরকে পদানত রাখার চালবাজী করিতে যাইবে? এখানে আরও স্মরণ রাখা দরকার যে, রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতিতে সমর-বিভাগ ও সেনাপতিগণের বিন্দুমাত্র প্রভাব নাই; একথা সোভিয়েট-বিদ্বেষী জন ফষ্টার ডুলেস পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং রাশিয়া স্বদেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে একান্ত শান্তিপূর্ণ নীতি অনুসরণ করিতে পারিতেছে। মার্শাল ষ্ট্যালিন্ বলিতেছেন যে, রাশিয়ার এই সমস্ত শান্তি-প্রস্তাবে যোগ দিলে ইঙ্গ-মার্কিণ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং এ-জন্যই রাশিয়ার বিরুদ্ধে অনবরত "আক্রমণশীল সোভিয়েট সাম্যবাদে"র মিথ্যা

প্রচার চলিতেছে। এমন কি, আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন—এই বৃহৎ পঞ্চশক্তির মধ্যে একটি শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য ষ্ট্যালিন ও সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট বার বার যে প্রস্তাব করিতেছেন, তাহা পর্যন্ত অগ্রাহ্য করা হইতেছে।

সুতরাং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রকৃতই শান্তি চাহে, এমন বিশ্বাস রাশিয়া কিভাবে পোষণ করিবে? আমেরিকায় এবং মার্কিণ-পৃষ্ঠপোষিত রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিদিন যুদ্ধের হুজুগ ও যুদ্ধের ব্যয় বাড়িয়া চলিতেছে, আর রাশিয়ায় উহা কমিতেছে। কেবল তাহাই নহে, গত মার্চ মাসে স্বয়ং মার্শাল ষ্ট্যালিনের উপস্থিতিতে সোভিয়েট পার্লামেণ্ট যুদ্ধের স্বপক্ষে সর্বপ্রকার প্রচারকার্যকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়াছেন এবং এই প্রকার প্রচারকার্যকে একটি অপরাধ হিসাবে দণ্ডনীয় বলিয়া আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে! অন্য কোন ধনতান্ত্রিক দেশে কি ইহা ঘটিয়াছে?

* * *

প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান এবং বর্তমান ১৯৫১ সাল পর্যন্ত গত ৩০ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া সোভিয়েট রাশিয়া পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত নীতি ও পন্থার অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, আমরা পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলিতে সেগুলির ঐতিহাসগত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছি। আন্তর্জাতিক রাজনীতির সতর্ক পাঠক নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিবেন যে, সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতির এই ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে ইহাকে কয়েকটি পর্যায়ে বা যুগের মধ্যে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা—

(১) আত্মরক্ষার যুগ—১৯১৭ সাল হইতে ১৯৩৩ সাল।
(২) আক্রমণ-বিরোধিতার যুগ—১৯৩৩ সাল হইতে ১৯৪১ সাল।
(৩) মহাযুদ্ধে মৈত্রীর যুগ—১৯৪১ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল।
(৪) সাম্রাজ্যবাদ (মার্কিণ) বিরোধিতার যুগ—১৯৪৫ সাল হইতে ১৯৫০ সাল।

এক হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়ার এই বিভিন্ন যুগের ইতিহাসকে গত ৩০ বৎসরের আন্তর্জাতিক জগতের শান্তি ও যুদ্ধের কিম্বা সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের এক রোমাঞ্চকর ও ভয়াবহ দ্বন্দ্বের ইতিহাস বলিয়াও গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত মানুষের সভ্যতা পৃথিবীব্যাপী জনসাধারণের প্রগতি, কল্যাণ ও শান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে না।......

আত্মরক্ষা, শান্তি ও আক্রমণ-বিরোধিতার জন্য সোভিয়েট রাশিয়া এ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে যে সমস্ত চুক্তি, সন্ধি ও মৈত্রীতে আবদ্ধ হইয়াছে,

উহার একটি সম্পূর্ণ তালিকা আমরা পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য নীচে সংগ্রহ করিয়া দিলামঃ—

(ক) অনাক্রমণ ও নিরপেক্ষতার চুক্তি

বৎসর — চুক্তি বা সন্ধির মর্ম

১৯১৮—ব্রেস্টলিটোভস্কের শান্তি সন্ধি।

১৯২১-২৩—পারস্য, আফগানিস্থান ও তুরস্কের সংগে শান্তি সন্ধি।

১৯২৪—চীনের সংগে শান্তি সন্ধি ও বৃটেন কর্তৃক স্বীকৃতি (সাময়িক)।

১৯২৫—তুরস্কের সংগে অনাক্রমণ চুক্তি (১৯৪৫ সালে বাতিল)।

১৯২৬—জার্মাণীর সংগে নিরপেক্ষতার চুক্তি।

১৯২৬—আফগানিস্থানের সংগে অনাক্রমণ চুক্তি।

১৯২৬—লিথুয়ানিয়ার সংগে অনাক্রমণ চুক্তি।

১৯২৭—ইরাণ বা পারস্যের সংগে নিরপেক্ষতার চুক্তি।

১৯৩২—ফিনল্যাণ্ডের সংগে অনাক্রমণ চুক্তি।

১৯৩৩—ইতালীর সংগে অনাক্রমণ চুক্তি। নভেম্বর মাসে আমেরিকার সংগে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন।

১৯৩৭—চীনের সংগে অনাক্রমণ চুক্তি।

১৯৩৯—নাৎসী জার্মাণীর সংগে অনাক্রমণ চুক্তি।

১৯৪১—যুগোশ্লাভিয়ার সংগে অনাক্রমণ চুক্তি।

১৯৪১—জাপানের সংগে নিরপেক্ষতার চুক্তি।

১৯৪১—বৃটেনের সংগে যুদ্ধের সহযোগিতার চুক্তি (জুলাই মাস)।

১৯৪২—আমেরিকার সংগে যুদ্ধের সহযোগিতার চুক্তি (জুলাই মাস)।

(খ) সামরিক মৈত্রী বা সন্ধির চুক্তি

বৎসর — মৈত্রীর মর্ম

১৯৩৫—ফ্রান্স ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সংগে পারস্পরিক সামরিক সাহায্যের চুক্তি।

১৯৩৬—বহির্মংগোলিয়ার সংগে সামরিক মৈত্রী।

১৯৩৯—এস্থোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার সংগে সামরিক মৈত্রী (দেশগুলি পরে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত)।

১৯৪২—বৃটেনের সংগে সামরিক মৈত্রী ও চুক্তি।

১৯৪২—লণ্ডনের পোলিশ গভর্ণমেণ্টের সংগে সামরিক মৈত্রী (১৯৪৩ সালে বাতিল)।

১৯৪২—ইরাণ ও বৃটেনের সঙ্গে পারস্পারিক সামরিক মৈত্রী।

১৯৪৩—চেকোশ্লোভাকিয়ার (মস্কোস্থিত) সঙ্গে সামরিক মৈত্রী।

১৯৪৪—নূতন ফ্রান্সের সঙ্গে সামরিক মৈত্রী।

১৯৪৫—জাতীয়তাবাদী চীনের সঙ্গে সামরিক সন্ধি।

১৯৪৫—যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে সামরিক মৈত্রী (১৯৪৯ সালে বাতিল)।

১৯৪৫—পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সামরিক মৈত্রী।

১৯৪৮—ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে সামরিক মৈত্রী।

১৯৪৮—রুমানিয়ার সঙ্গে সামরিক মৈত্রী।

১৯৪৮—হাঙ্গেরীর সঙ্গে সামরিক মৈত্রী।

১৯৪৮—বুলগেরিয়ার সঙ্গে সামরিক মৈত্রী।

(গ) আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষায় রাশিয়ার সহযোগিতা

১৯২৮—যুদ্ধকে বে-আইনী ঘোষণার জন্য কেলগ-ব্রিঁয়া চুক্তিপত্র স্বাক্ষর।

১৯২৯—এস্থোনিয়া, ল্যাটভিয়া, পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার সঙ্গে 'যুদ্ধ বে-আইনী' ঘোষণায় স্বাক্ষর।

১৯৩৩—ফিনল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও তুরস্কের সঙ্গে "পররাজ্য আক্রমণের" বিরুদ্ধে নূতন সংজ্ঞায় স্বাক্ষর।

১৯৩৫-৩৮—বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগদান ও ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের আক্রমণের বিরুদ্ধে সক্রিয় পন্থাবলম্বনের দাবী।

১৯৩৬—স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে সহযোগিতা ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি।

১৯৪৩—বিশ্ব-বিপ্লবের ভীতি দূর করিবার জন্য কোমিন্টার্ণ বাতিল।

১৯৪৬-৫০—ইউ-এন-ও'র সদস্যরূপে পৃথিবীর শান্তিরক্ষার জন্য বিভিন্ন বৈঠকে যোগদান ও বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপন।

উপরে সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত যে সমস্ত চুক্তি, সন্ধি ও মৈত্রীর পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইল, তাহা হইতে কি একথা মনে হয় যে, রাশিয়া 'আক্রমণশীল' ও 'লাল সাম্রাজ্যবাদী'?

পুনশ্চঃ

নভেম্বর, ১৯৫১।

উপরের এই প্রবন্ধগুলি লিখিত হইবার অন্ততঃ সাত মাস পরে এগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই, একমাত্র অবনতি ছাড়া। কারণ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতিও বিশেষ কোন দিক-পরিবর্তন করে নাই। কিন্তু পূর্ব-এশিয়ার দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই পররাষ্ট্রনীতির প্রসঙ্গে স্মরণীয়। জেনারেল ম্যাকআর্থার, যিনি কোরিয়াতে ইউ-এন-ও'র পক্ষ হইতে এবং জাপানে ও দূরপ্রাচ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে সর্বাধিনায়করূপে দোর্দণ্ডপ্রতাপে "রাজত্ব" চালাইতেছিলেন, গত ১১ই এপ্রিল প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কর্তৃক তিনি অকস্মাৎ পদচ্যুত এবং তাঁহার স্থলে লেঃ-জেনারেল রিজওয়ে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হইলেন। তিনি ট্রুম্যানের চেয়েও অধিকতর উগ্রতা এবং নগ্নতার সহিত কোরিয়াতে ও পূর্ব-এশিয়ায় মার্কিণ নীতি প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং কতকগুলি নির্দেশ 'অমান্য' করিয়া নিজের ইচ্ছামত চলিতে চাহিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার এই পদচ্যুতি সারা পৃথিবীতে হুলস্থূল সৃষ্টি করিয়াছিল, তথাপি ইহা দ্বারা মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতির মূলগত কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। ঠিক ইহারই পাশাপাশি সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি আর একবার শান্তির সন্ধান করিয়াছে।

গত ২৪শে জুন ইউ-এন-ও'র সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ মালিক কোরিয়ার অস্ত্রসম্বরণ ঘটাইবার জন্য বিভিন্ন যুদ্ধরত শক্তিবর্গের একটি বৈঠক আহ্বানের প্রস্তাব করেন। রাশিয়ার এই প্রস্তাব অনুযায়ী বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে আলোচনার পর গত ১০ই জুলাই তারিখে ৩৮নং অক্ষরেখার নিকটবর্তী কায়েসং সহরে এই যুদ্ধবিরতি বৈঠকের অধিবেশন আরম্ভ হয়। কিন্তু বর্তমান নভেম্বর মাস পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি আলোচনার কোনই মীমাংসা হয় নাই—পরস্পরের অভিযোগে ও পাল্টা অভিযোগে এই বৈঠক বার বার বানচাল হইয়া যাইতেছে এবং উভয় পক্ষেই আবার যুদ্ধ চলিতেছে। অবশ্য যুদ্ধবিরতির আলোচনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়াও যায় নাই, যদিও সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

কোরিয়া ও পূর্ব-এশিয়াতে যখন এই অবস্থা তখন মধ্যপ্রাচ্যে আর এক সংকটের উদ্ভব হইয়াছে। পৃথিবীর বৃহত্তম তৈল-কেন্দ্রের অন্যতম ইরাণ হইতে বৃটেনের উচ্ছেদ ঘটিয়াছে। ইরাণী গভর্ণমেণ্ট এ্যাংলো-ইরাণীয়ান্ পেট্রোল

কোম্পানীকে কার্যতঃ "বাজেয়াপ্ত" করিয়া সমস্ত পেট্রোল সম্পদকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়াছেন এবং বৃটেনের আপোষ-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এ পর্যন্ত আমেরিকার দৌত্যও ব্যর্থ হইয়াছে। ইরাণের পরি মিশরও বৃটেনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে। ১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশরীয় সন্ধি এবং ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের সুদান-চুক্তি বাতিল করিয়া দিয়া বর্তমান মিশরীয় গভর্ণমেণ্ট সুয়েজখাল হইতে বৃটিশ সৈন্য এবং সুদান হইতে বৃটিশ শাসন বিনাসর্তে অপসারণের জন্য দাবী জানাইয়াছেন। এই দাবীর সঙ্গে আপোষ করিবার জন্য ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষ মিশরের নিকট 'মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা' প্ল্যানে যোগদানের জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু মিশর তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যের এই রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের সঙ্গেও আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার সংঘাত চলিতেছে। সোভিয়েট রাশিয়া তুরস্কসহ সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলিকে জানাইয়া দিয়াছে যে, অতলান্তিক চুক্তি কিম্বা মধ্যপ্রাচ্য রক্ষার চুক্তি,—ইঙ্গ-মার্কিণ প্রস্তাবিত যে-কোন সামরিক পরিকল্পনায় যোগ দিলেই উহা সোভিয়েট-বিরোধী কার্য বলিয়া গণ্য করা হইবে। কারণ, রাশিয়ার মতে এই সমস্ত পরিকল্পনার শেষ লক্ষ্য হইতেছে সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ এবং উহার বিরুদ্ধে বেষ্টনী সৃষ্টি। রাশিয়ার এই কড়া প্রতিবাদের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলি আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িতেছে এবং ইরাণ ও মিশর ক্রমশঃ রাশিয়ার সহিত অধিকতর মৈত্রীর দিকে ঝুঁকিতেছে।

মোট কথা, সোভিয়েট-মার্কিণ দ্বন্দ্ব স্ব স্ব পররাষ্ট্রনীতির মারফৎ এমনভাবে প্রতিফলিত হইতেছে যে, অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রগুলির ভাগ্যও উহার সঙ্গে জড়াইয়া পড়িতেছে। ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক। কারণ, সমগ্র পৃথিবী আজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনে অবিচ্ছেদ্য। ফলে, এক স্থানের আঘাত অন্য স্থানে প্রত্যাঘাতের সৃষ্টি করে। তথাপি বিদ্বেষমুক্ত মন লইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, সমসাময়িক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রেও সোভিয়েট রাশিয়া যুদ্ধের বিরোধী এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্‌গ্রীব, কিন্তু সেই শান্তি যে-কোন মূল্যে নয়!

রুশ-জার্ম্মাণ সংগ্রাম

রুশ-জার্ম্মাণ সংগ্রামের বিশদ ইতিহাস

জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী

জাপান যুদ্ধের রোমাঞ্চকর কাহিনী

জীবন-মৃত্যু (কবিতার বই)

যুগান্তর-সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

ভারতের সামন্ত রাজ্য

শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী

বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

শিল্প-লিপি

ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

সমালোচনা-সাহিত্য

ডাঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল

বঙ্কিম-সাহিত্য-পরি. িতি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ (সাহেি : -াট্য)—২য় পর্ব

শ্রীঅলোক সেন

এ, মুখার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা-১২